নঞ-তৎপুরুষ

"বনফুল"

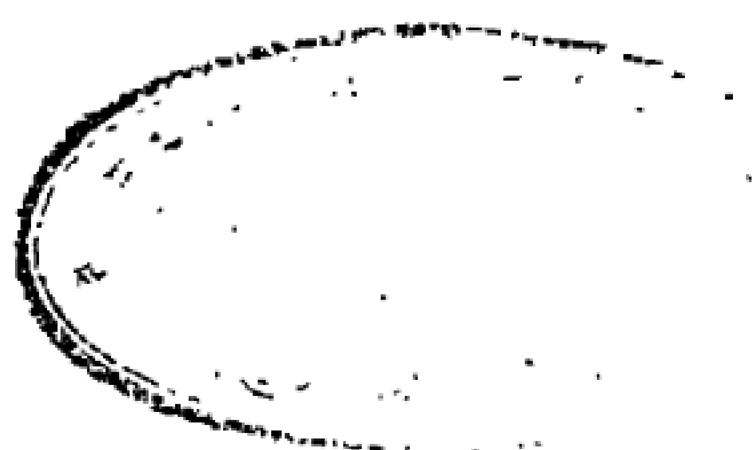
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৫৩
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
মুদ্রাকর—অনিল কুমার বিশ্বাস
উৎপল প্রেস
১১০।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
তিন টাকা

এই উপন্যাসটি ফিয়ডর ডষ্টয়ভেস্কির 'দি ইটার্যাল হাজব্যাণ্ড' অবলম্বনে লেখা]

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

করকমলেষু—



১

গ্রীষ্মকাল এসে পড়ল কিন্তু পুরন্দরবাবু কার্য্যগতিকে কোলকাতা ছাড়তে পারলেন না। দার্জিলিং যাবেন ঠিক ছিল কিন্তু সমস্ত পণ্ড হয়ে গেল। হাইকোর্টে মকোর্দ্দমাটার কোন কুলকিনারাই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। জমিদারি সংক্রান্ত এই মকোর্দ্দমাটা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে যেন। বেশ ভালর দিকেই যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ কেমন বিগড়ে গেল। হু হু করে' টাকা খরচ হচ্ছে, নামজাদা বড় বড় উকিল লাগিয়েছেন, কিন্তু কিছু হচ্ছে না। ক্রমশই অধীর হয়ে উঠছেন তিনি। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, নিজেই নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে সুরু করেছেন। দলিলপত্র দেখে নিজে যে এজাহারটা লিখেছিলেন তাঁর উকিল নাকচ করে' দিলে সেটাকে। তিনি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন, সাক্ষী জোগাড় করছেন, একে বলছেন, তাকে ধরছেন—এবং সম্ভবত কাজের চেয়ে অকাজই করছেন বেশী। তাঁর উকিল অন্তত সেই কথাই বলছে। সে তাঁকে দার্জিলিং পাঠাতে পারলে বাঁচে, কিন্তু পুরন্দরবাবু কিছুতেই যেতে পারছেন না। কোলকাতা শহরের ধুলো, ধোঁয়া, গরম, কলের তেল, পচা মাছ, শ্যামবাজারে তাঁর বাড়ির পাশের ড্রেনটা সব হার মেনেছে। পুরন্দরবাবুকে কিছুতেই কোলকাতা থেকে তাড়ান যাচ্ছে না। "কিচ্ছু হচ্ছে না, সব গেল" বারম্বার তিনি মনে মনে আবৃত্তি করছেন, স্নায়বিক বিকার বেড়ে যাচ্ছে রোজ, কিন্তু কিছুতেই কোলকাতা ছাড়তে পারছেন না।

একদা পরিপূর্ণ এবং বিচিত্র জীবন ছিল পুরন্দর রায় চৌধুরীর। যদিও বয়সের হিসাবে তিনি যৌবন-সীমা পার হয়েছেন—এখন আটত্রিশ বছর বয়স তাঁর—কিন্তু বুড়ো হবার বয়স হয়নি এখনও। কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছে

বার্দ্ধক্য এসে গেছে এবং অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে এসে গেছে। বয়সের হিসাবে নয় অন্তরের মানদণ্ডে, বাইরে থেকে নয় ভিতর থেকে অনুভব করছেন তিনি এবং যতই সেটা অনুভব করছেন ততই যেন জীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন আরও। বাইরে থেকে এখনও তাঁকে বেশ শক্ত সমর্থ দেখায়। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তি তিনি, একমাথা কালো কোঁকড়ান চুল—একটি পাকেনি এখনও। যদিও খুব ছিমছাম নন, কিন্তু একটু নজর করে' দেখলেই বোঝা যায় যে অভিজাত বংশের ছেলে তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়েছিলেন। কথায় ব্যবহারে বনেদি ঘরের চিহ্ন সুস্পষ্ট এখনও। ইদানিং অবশ্য চরিত্রে একটু শৈথিল্য এসেছে, মেজাজও খিটখিটে হয়েছে—তবু কিন্তু অভিজাতসুলভ সহজ সহৃদয়তা অবলুপ্ত হয় নি এখনও চরিত্র থেকে। এ ছাড়া তাঁর এমন একটা গভীর আত্মপ্রত্যয় আছে—যা প্রায় অহঙ্কারেরই সম-গোত্র। বুদ্ধি বিদ্যা সংস্কৃতি, এমন কি কিঞ্চিৎ প্রতিভা সত্ত্বেও এই দাম্ভিকতার ঊর্দ্ধে উঠতে পারেন নি তিনি কিছুতেই। তাঁর চোখে মুখে ফুটে বেরুত তা। চোখে মুখে একটা সরলতাও ছিল। পুরাকালে তাঁর টকটকে লাল মুখখানাতে এমন একটা নারীসুলভ কমনীয়তা ছিল যা সকলকে মুগ্ধ করত, বিশেষ করে' নারীদেরই। এখনও অনেকে তাঁকে দেখে বলে—"বাঃ কি চমৎকার রং, কি সুন্দর স্বাস্থ্য ভদ্রলোকের!" কিন্তু তিনি যে ভিতরে ভিতরে স্নায়বিক বিকারে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন—তা কেউ বুঝতে পারত না। বড় বড় টানাটানা চোখ ছিল তাঁর—দশ বছর আগে এই চোখই মোহ বিস্তার করত অনেকের মনে—এমন প্রদীপ্ত, এমন প্রাণবন্ত ছিল যে লোকে মুগ্ধ না হয়ে পারত না। এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে সে চোখের দীপ্তি নিবে গেছে, চোখের কোণে বলি রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ, আশায় আনন্দে ঝলমল করত একদিন যে চোখের দৃষ্টি, এখন তাতে ফুটে উঠছে নীতিচ্যুত বিপর্য্যস্ত ছন্নছাড়া জীবনের ভণ্ডামি, সন্দেহ ও অবিশ্বাস—কিঞ্চিৎ ব্যথা এবং হতাশা। কেমন যেন একটা নাম-হীন ব্যথা এবং অনির্দ্দিষ্ট

হতাশা। যখন একা থাকতেন তখন এই হতাশাটা আরও যেন প্রবল হয়ে উঠত। আশ্চর্য্যের বিষয় যিনি মাত্র দু'বছর আগে হাল্লা হৈ হৈ নিয়ে থাকতে ভালবাসতেন, হাসতেন হাসাতেন, চমৎকার গল্প বলতে পারতেন তিনি এখন একা থাকতে পেলে আর কিছু চান না। এই কারণে, তিনি বহু লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেছেন যাঁদের সঙ্গে এখনও (মানে, আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও) সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করলেও চলত। অবশ্য দাম্ভিকতা একটা কারণ। তা ছাড়া কোন কিছুর উপরই আস্থা ছিল না আর। কিছু আর ভাল লাগত না, কারও সঙ্গ আর সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু ক্রমশ একা থেকে থেকে তাঁর এই দাম্ভিকতারও রূপ বদলে গেল। একটুও কমল না, বরং ঠিক উল্টো। কিন্তু তা এক বিশেষ রকম অভিনব দাম্ভিকতায় পরিণত হল, নানা বিভিন্ন অদ্ভুত কারণে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়তেন—যেন তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগত। কারণগুলো অদ্ভুত—পূর্ব্বে একথা ভাবাও অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। সেগুলো ঠিক আধিভৌতিক নয়, যেন আধ্যাত্মিক। "আধ্যাত্মিক কারণে আরও আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়া সম্ভব না কি"—নিজেই মনে মনে বলতেন, কিন্তু কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারতেন না।

না, কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারতেন না। একটা 'আধ্যাত্মিক' ব্যাপার সর্ব্বদাই চিত্তকে আকুল করে' রাখত। পূর্ব্বে এমন কখনও হয় নি—এ সব নিয়ে মাথাই ঘামান নি কখনও ইতিপূর্ব্বে। তিনি সেই সব ধারণাকেই আধ্যাত্মিক বলতেন যা কিছুতেই হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছুতেই যায় না! নিজের অন্তরে অন্তরে তা মানতেই হয়। লোক সমাজে পাঁচজনের সামনে অবশ্য হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়—লোক-সমাজের কথাই স্বতন্ত্র! প্রয়োজন হলে কালই তিনি পাঁচজনের সামনে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে রসিকতা করবেন হয় তো। বিবেকের কথা, বিশ্বাসের কথা তখন মনেই থাকবে না। আর প্রকৃতই তাই হচ্ছে। তথাকথিত 'স্বাধীন চিন্তা'

'স্বাধীন মতবাদ' প্রভৃতির কবলে' পড়ে এই সেদিন পর্য্যন্ত তিনি এই করেছেন। বিনিদ্র নয়নে সারারাত যা ভাবেন সকালে লজ্জা পান তার জন্য। আজকাল রাত্রে ঘুমও হচ্ছে না। কিছুদিন থেকে এ-ও লক্ষ্য করছেন যে আজকাল মনটাও বড় সহজে অভিভূত হয়ে পড়ে—কারণ ক্ষুদ্র বৃহৎ না-ই হোক। সুতরাং মনের উপর নির্ভর করতে ভরসা হয় না তাঁর। কিন্তু কতকগুলো ব্যাপার তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইদানিং এক অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে। রাত্রে তিনি যা ভাবেন, যা সত্য বলে' অনুভব করেন সকালে ঠিক তা ভাবতে পারেন না, সকালে তা সত্য বলে' স্বীকার করতে দ্বিধা হয়। রাত্রিতে সমস্ত রূপান্তরিত হয়ে যায় যেন। একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে বলেছিলেন ব্যাপারটা। ডাক্তারটি অবশ্য বন্ধুলোক—রহস্যভরেই বলেছিলেন তাকে কথাটা। ডাক্তারবাবু বললেন যে ওরকম হয়। বিশেষত যারা ভাবুক প্রকৃতির তাদের মনে একাধিক বিভিন্ন চিন্তাধারার অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। বিনিদ্র রজনীরও এমন একটা অদ্ভুত প্রভাব আছে যে, সমস্ত জীবনের সংস্কার রাতারাতি বদলে যেতে পারে। সব সময়ে হয় না অবশ্য। কেউ যদি তার এই দ্বিবিধ সত্তার সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতন হয়ে কষ্ট পায় তাহলে অবশ্য সেটা রোগেরই সূচনা বলে' ধরতে হবে এবং তার চিকিৎসা করা উচিত। সব চেয়ে ভাল হচ্ছে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সুরটাই বদলে ফেলা। আহার, বিহার, পারিপার্শ্বিক সমস্ত আমূল পরিবর্ত্তন করা। সব ছেড়ে ছুড়ে দিনকতকের জন্য কোথাও বেরিয়ে পড়া মন্দ নয়···ওষুধ অবশ্য আছে···কিন্তু···

পুরন্দরবাবু আর শুনছিলেন না—তিনি যা জানতে চাইছিলেন তা জেনে গেছেন। এটা একটা অসুখেরই সূচনা তাহলে।

"অসুখ? এই সব আধ্যাত্মিক ধারণা অসুখ ছাড়া কিছু নয় তাহলে।" মন'কিন্তু কিছুতেই মানতে চাইত না এ কথা।

অনতিকাল পরে আর একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। এতদিন যা রাত্রিতেই নিবদ্ধ ছিল তা সকালেও ঘটতে লাগল। তফাত রাত্রিতে মনটা

বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত সকালে হত রাগ। রাত্রির আবেগ সকালে রূপান্তরিত হত তিক্ত আত্মগ্লানিতে। অতীতের—এমন কি সুদূর অতীতের কতকগুলো ঘটনাও—বার বার মনে পড়ত। অদ্ভুতভাবে মনে পড়ত। কিছুতেই এড়াবার উপায় ছিল না। সত্যিই আশ্চর্য্য কাণ্ড। পুরন্দরবাবুর ধারণা হয়েছিল যে তাঁর স্মৃতিশক্তি কমে যাচ্ছে। পরিচিত লোককে চিনতে পারেন না, নাম মনে থাকে না, বই পড়বার দুই একদিন পরেই গল্পটা ভুলে যান—এ সবের জন্যে অনেকবার অপ্রস্তুতও হতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু স্মৃতি-ভ্রংশ হওয়া সত্ত্বেও সুদূর অতীতের এই ঘটনাগুলো—যা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি—এমন স্পষ্ট এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ এমন আশ্চর্য্য রকম নিখুঁতভাবে স্মৃতিপটে ফুটে উঠছে কি করে? মনে হচ্ছে কিছুই যেন অতীত হয় নি, আবার যেন ঘটছে সব, আবার যেন সে জীবন ভোগ করছেন তিনি। অস্বাভাবিক অলৌকিক কাণ্ড বলে' মনে হচ্ছে তাঁর এটা। এমন কতকগুলো ঘটনা মনে পড়ছে যা বিস্মৃতির তলায় একেবারে তলিয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়—অতীতের অনেক কথাই অনেকের অনেক সময় মনে পড়ে যায় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই—কিন্তু পুরন্দরবাবুর যা হচ্ছিল তা একটু বিস্ময়কর। শুধু স্মৃতি নয়, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অনুভূতি যেন প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করছিলেন তিনি—মনে হচ্ছিল কেউ যেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই জীবনের ঘটনা প্রবাহের মাঝখানে। অতীত জীবনের এই ঘটনাগুলোকে হঠাৎ পাপ বলেই বা মনে হচ্ছে কেন? নিজে বিচার করে' যে সে গুলোকে পাপ বলে' ঠিক করছেন তা নয়—নিজের এই ভারাক্রান্ত, বিষণ্ণ অসুস্থ মনের উপর কিছুমাত্র আস্থা নেই তাঁর—কিন্তু আত্মগ্লানিতে সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে অকারণে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ছে। মাত্র দু'বছর আগেও কি তিনি ভাবতে পারতেন—কেউ কি ভাবতে পারত—যে তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়া সম্ভব!

প্রথম প্রথম যে ঘটনাগুলো তাঁর মনে পড়ছিল সেগুলো ঠিক অশ্রুজনক নয়—ক্ষোভজনক! জীবনের ব্যর্থতার কথা মনে পড়ছিল, কোথায় কবে অপমানিত হয়েছিলেন তা-ও মনে পড়ছিল। একবার একটা লোক কুৎসা রটিয়েছিল তাঁর নামে, ফলে ভদ্রসমাজে গতিবিধি বন্ধ হয়ে গেল তাঁর কিছুদিন। প্রকাশ্য সভায় একটা লোক অপমান করেছিল তাঁকে একবার কিন্তু তিনি মানহানির মকোর্দ্দমা করেন নি: আর একবার এক মহিলা মজলিসের কয়েকটি সুন্দরী সভ্যা তাঁর সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গোক্তি করেছিল তার জবাব দিতে গিয়ে আরও হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন তিনি: টাকা ধার করে' শোধ করেন নি এরকম কয়েকটা ঘটনাও মনে পড়ল—সামান্য সামান্য টাকা—কিন্তু শোধ করা হয় নি। শুধু তাই নয় তাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করেছেন—নিন্দাও করেছেন তাদের নামে। খুব যখন মন খারাপ হ'ত তখন মনে পড়ত—দু' দুবার কি জঘন্য বাজে ব্যাপারে টাকা উড়িয়েছেন তিনি। এক আধটাকা নয়, প্রচুর টাকা! কিন্তু এসবের চেয়ে গুরুতর ঘটনাও মনে পড়ে যেত সঙ্গে সঙ্গেই।

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বুড়ো কেরাণীটার কথা মনে পড়ে যেতে—সেই নিরীহ পক্ককেশ লোকটাকে চোখের সামনে দেখতে পেতেন যেন, বিস্মৃতির তলায় সম্পূর্ণরূপে তলিয়ে গিয়েছিল অথচ···হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে যেত। বহুকাল পূর্ব্বে প্রকাশ্যে লোকটাকে অসঙ্কোচে অপমান করেছিলেন তিনি। কোন কারণ ছিল না, কেবল বাহবা পাবার জন্য তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করে' একটু আত্মশ্লাঘা অনুভব করবার জন্য অনেক লোকের মাঝখানে অপ্রস্তুত করেছিলেন লোকটাকে। এই রসিকতাটি করার জন্যে বন্ধুবান্ধবদের কাছে খাতির বেড়ে গিয়েছিল তাঁর। ঘটনাটা এত দিন আগে ঘটেছিল যে ভদ্রলোকের নামটা পর্য্যন্ত ঠিক মনে করতে পারছিলেন না তিনি···কিন্তু আর আর, সমস্ত পরিষ্কার মনে পড়ছিল···পারিপার্শ্বিক সমস্ত ছবি হুবহু যেন দেখতে পাচ্ছিলেন। বেশ

মনে পড়ছে, ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের পক্ষ সমর্থন করছিলেন—অবিবাহিত মেয়ে—যৌবন সীমা পার হয়েছে—তাকে কেন্দ্র করে' নানারকম গুজব উঠেছিল তখন। ভদ্রলোক প্রথম প্রথম বেশ জোর গলায় তর্ক করছিলেন, পুরন্দরের বাক্যবাণে বিধ্বস্ত হয়ে হঠাৎ তিনি কেঁদে ফেললেন—সকলের সামনে। এখন হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে সেই ছবিটা মনে পড়ছে। ছোট ছেলের মতো কাঁদছিল লোকটা—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—দু'হাতে মুখ ঢেকে। হঠাৎ মনে হল এ ছবি তাঁর মনে বরাবর আঁকা আছে—কোনদিনই মুছে যায় নি। আর আশ্চর্য্য—তখন যা খুব কৌতুকজনক বলে' মনে হয়েছিল—যেমন ওই ছোট ছেলের মতো দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদাটা—এখন তা আর মোটেই কৌতুকজনক নেই। বরং ঠিক উল্টো।

আর একটা ঘটনা। একবার এক গরীব স্কুল মাষ্টারের যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে কুৎসিৎ একটা রসিকতা করেছিলেন তিনি—কেবল নিছক রসিকতার খাতিরেই। সে কথা তার স্বামীর কানে গিয়ে উঠেছিল। ফলে কি হয়েছিল তা অবশ্য তিনি জানেন না, কারণ ঠিক তারপরই তাঁকে বাইরে চলে যেতে হয়েছিল—কিন্তু এখন তাঁর মনে হচ্ছে ও জাতীয় রসিকতার বিষময় ফল হওয়া অসম্ভব নয়—হয় তো হয়েছিল···এই নিয়ে তাঁর কল্পনা হয় তো অনেক জাল বুনতো—কিন্তু আর একটা কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। এই সেদিনের কথা। সামান্য একটা চাকরাণির সঙ্গে কি কাণ্ড করলেন তিনি···তার যে প্রেমে পড়েছিলেন তা নয়···কিন্তু তাকে নিয়ে যা ঘটল তা লজ্জাকর। আর সব চেয়ে লজ্জাকর তাকে ফেলে পালানো··· অসহায় শিশুটার দিকে পর্য্যন্ত চেয়ে দেখেন নি তিনি···অবশ্য এও ঠিক—একটা জরুরি দরকারে তাঁকে চলে' যেতে হয়েছিল সে সময়—দেখা করবার সময়ও ছিল না—তারপর এক বচ্ছর ধরে' তিনি মেয়েটাকে খুঁজেছিলেন, কিন্তু আর পান নি। এ রকম বহু ঘটনার স্মৃতি মনে জাগছে···মনে হচ্ছে আরও আছে। আত্মসম্মান সত্যিই ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ।

আত্মসম্মানবোধের মানদণ্ডটাও তাঁর বদলে যাচ্ছিল ইদানিং। আজকাল (অবশ্য, মাঝে মাঝে) পায়ে হেঁটে বেড়াতে তাঁর আর লজ্জা হত না তত। নিজের গাড়ি নেই, রাস্তায় রাস্তায় আপিশে আদালতে টো-টো করে' ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পরণে আড় ময়লা জামা কাপড়—আগে এ অবস্থায় পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে দেখা হলে কুণ্ঠিত হয়ে পড়তেন—আজকাল ভ্রূক্ষেপই করেন না। ভণ্ডামি নয়। সত্যিই এরকম মনোভাব হচ্ছিল তাঁর আজকাল কিন্তু সব সময়ে নয়। মাঝে মাঝে এরকম হত—বিশেষ করে' যে সময়ে তাঁর মানসিক চঞ্চলতা বাড়ত, স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় অবসন্ন হয়ে পড়তেন—সেই সময়ে মনে হ'ত···। কিন্তু না, আত্মসম্মানবোধের চেহারাটা বদলে ছিল সত্যিই। যে সব বাহ্যিক আড়ম্বর আত্মমর্য্যাদার জন্যে প্রয়োজনীয় মনে হত আগে, আজকাল তার অভাব বা আধিক্য মনকে আর নাড়া দেয় না তত। আজকাল সমস্ত মন একটি কথাই ভাবছে কেবল এবং দিবারাত্রি সেই দিকে উন্মুখ হয়ে আছে।

শ্লেষ-ভরে মাঝে মাঝে ভাবতেন (এবং যখনই আজকাল নিজের সম্বন্ধে ভাবতেন শ্লেষ থাকত তাতে)—"স্বর্গে হয় তো ভগবান ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আমার জন্যে। আমার চরিত্র সংস্কার না করা পর্য্যন্ত ঘুম হচ্ছে না তাঁর বোধ হয়। ক্রমাগত জাগিয়ে তুলছেন বীভৎস স্মৃতিগুলোকে। অনুতাপের অশ্রু! হতে পারে। কিন্তু কিচ্ছু হবে না। বন্দুক ছুঁড়লে কি হবে—টোটা একদম খালি! আমি জানি না নিজেকে? স্মৃতি অনুতাপ চোখের জল—সমস্ত সত্ত্বেও কিছু করবার উপায় নেই আমার। প্রৌঢ়ত্বের প্রজ্ঞা সত্ত্বেও আমি কিছু বদলাই নি। কালই যদি প্রলোভন আসে, কালই যদি ঘটনাচক্র এমন হয় যে একটা গুজব রটিয়ে দিলেই আমার স্বার্থসিদ্ধি হবে, কালই আমি আবার গুজব রটিয়ে দিতে পারি যে ওই স্কুলমাষ্টারের রূপসী বউ লুকিয়ে টাকা নিয়েছিল আমার কাছ থেকে। কালই পারি আবার—একটু ইতস্তত করব না। অতিশয় ঘৃণ্য জেনেও করব না। ফের যদি

আমাকে সেই পুরুতটা আবার অপমান করে···আবার জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব তার—তার মেয়ের কান্নায় দৃকপাত করব না। সুতরাং টোটায় কিছু নেই···বন্দুক ছোঁড়া বৃথা। বুঝলেন ভগবান মশাই? অতীতের দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়ে, লাভ কি...নিজের হাত থেকেই যে পরিত্রাণ নেই আমার···"

যদিও স্কুল মাষ্টারের স্ত্রীর নামে গুজব রটাবার অথবা পুরোহিতের মুখে জুতো মারবার কোন সুযোগ আর উপস্থিত হল না—কিন্তু উপস্থিত হলে যে তিনি দ্বিধা করবেন না এই চিন্তাই পুরন্দরবাবুকে দগ্ধ করতে লাগল। কোন মানুষই অনুতাপানলে একটানা দগ্ধ হয় না, মাঝে মাঝে ছাড়া পায় এবং সেই মুক্ত অবস্থায় জীবনকে উপভোগও করে।

পুরন্দরবাবুরও অনুতাপের অবকাশে জীবন উপভোগে আপত্তি ছিল না। অরুচিও ছিল না। কিন্তু কলিকাতা-প্রবাস মাঝে মাঝে দুঃসহ হয়ে উঠত ওঁর কাছে। জ্যৈষ্ঠমাস শেষ হতে চলল—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করছিল মকোদ্দমা চুলোয় যাক—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, পিছন দিকে না চেয়ে··· সোজা কোথাও দৌড় দিতে। বনে পর্ব্বতে যেখানে হোক। হরিদ্বারে গেলে হয়! কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই সব উলটে গেল আবার। মনে হল—'হরিদ্বারেই যাই আর যেখানেই যাই 'কর্মলি' তো ছাড়বে না কিছুতেই। তা ছাড়া দায়িত্ব যখন নিয়েছি—তখন ফেলে পালানোর কোন মানে হয় না। পালাবই বা কেন? এই ধুলো, এই গরম, এই বিশৃঙ্খলা—এই তো বেশ। আদালতে ওই যে শকুনের ঝাঁক বসে রয়েছে—প্রকাশ্যভাবে দিব্যি ছেঁড়াছেড়ি করে' খাচ্ছে—সঙ্কোচ নেই, শঙ্কা নেই, ভণ্ডামি নেই। রাস্তায় জনস্রোত চলেছে, স্বার্থপর, ভীরু, লোভীর দল···তার মতো পাষণ্ডের পক্ষে এই তো স্বর্গ! সমস্তই খোলাখুলি, সমস্তই স্পষ্ট পরিষ্কার—ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। তথাকথিত ভদ্র সমাজের মুখোস-পরা ভণ্ডামির চেয়ে এ ঢের ভাল। এ সারল্যকে বরং শ্রদ্ধা করে চলে। যাব না—এইখানেই থাকব আমি।"

২

১৫ই জ্যৈষ্ঠ। অসম্ভব রকমের গরম পড়েছে। সেদিন পুরন্দরবাবুকে ঘোরাঘুরিও করতে হয়েছে খুব, পায়ে হেঁটে গাড়ি চড়ে'—সবরকমে। কর্পোরেশনের নামজাদা মেম্বর এবং উকিল বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গে দেখা করার বিশেষ দরকার, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছেন না তাঁকে। শেষে ঠিক করেছেন সন্ধ্যে বেলা—বালিগঞ্জে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে অতর্কিতে ধরবেন। ছটার সময় একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকলেন। রোজই ঢোকেন। রোজই প্রায় টাকা দেড়েক খরচ হয়ে যায়। আগে যখন সচ্ছল অবস্থা ছিল—দশ টাকার কম হত না। এখন দেড় টাকায় কুলিয়ে নিতে হয়। অবস্থা খারাপ হয়েছে—উপায় কি! খেতে বসে যদিও রোজ মনে হত এসব অখাদ্য খাওয়া যায় না—খেতে আরম্ভ করলে কিন্তু শেষ করে' ফেলতেন সব—কিছু পড়ে' থাকত না। বরং এমন গোগ্রাসে খেতেন যেন কতদিন উপবাসী আছেন। তৃপ্তিও যে না হত তা নয়। নিজের এই বুভুক্ষা দেখে নিজেই অবাক হয়ে যেতেন। ভাবতেন—"দুষ্ট ক্ষিধে এ। স্বাভাবিক নয়। হতেই পারে না"।

সেদিন হোটেলে যখন ঢুকলেন, তখন মনটা খিঁচড়ে আছে। চেয়ারটা সশব্দে টেনে বসলেন, টেবিলের উপরে দুই কনুএর ভর দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। খোশমেজাজে থাকলে তিনি শিষ্টতার চরম করতে পারেন—কিন্তু এখন মনের অবস্থা এমন যে সামান্যতম কারণে চীৎকার চেঁচামেচি করে' প্রলয়কাণ্ড করে' বসাও অসম্ভব নয় কিছু। অকারণে

কণ্ঠস্বর চড়িয়ে হুকুম করলেন—এই কাটলেট্ দিয়ে যা! কাটলেট্ দিয়ে গেল···ভেঙ্গে খেতে যাবেন···হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন—একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়ে গেল···ভগবান জানেন কি করে'—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যেন তিনি তাঁর অবসাদের মূল কারণটা আবিষ্কার করে ফেললেন। বিশেষ করে' এই ক'দিন থেকে যে অনির্দ্দিষ্ট অসহ্য মানসিক যন্ত্রণাটা তিনি ভোগ করছিলেন—এক মুহূর্ত্তের জন্য যা নিস্তার দেয়নি তাঁকে—হঠাৎ যেন তার কারণটা বুঝতে পারলেন তিনি। জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল সমস্ত।

"সেই লোকটা !"···একটু উত্তেজনাভরেই অস্ফুট কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন তিনি—"বেঁটে রোগা সেই লোকটা ঠিক !"

ভাবতে লাগলেন এবং যতই ভাবতে লাগলেন ততই যেন আরও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল মনটা। অসাধারণ অদ্ভুত লোকটা! কিন্তু না, অসাধারণই বা কেন, অদ্ভুতই বা কি আছে এতে। বেঁটে রোগা লোক তো কত আছে!

প্রায় দিন পনের আগে—ঠিক মনে ছিল না তার, কিন্তু পনের দিনই হবে—কলেজ ষ্ট্রীট হ্যারিসন রোডের চৌমাথাটায় লোকটাকে প্রথম দেখেছিলেন তিনি। বেঁটে রোগা লোকটা। গট্ গট্ করে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখে যেন দাঁড়িয়ে পড়ল এবং খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। পুরন্দরবাবুর মনে হল মুখটা যেন চেনাচেনা। কোথায় যেন দেখেছেন। তখনই আবার মনে হল 'জীবনে কত সহস্র মুখই তো দেখেছি—সব মনে রাখা সম্ভব নাকি!' এগিয়ে গেলেন এবং প্রায় ভুলেই গেলেন তাঁর কথা। কিন্তু মনের অবচেতন লোকে ছাপটা লেগেই রইল এবং ক্রমশঃ যেন একটা নাম-হীন বিরক্তিতে রূপান্তরিত হল। এখন, পনের দিন পরে সমস্তটা স্পষ্ট মনে পড়ছে আবার, এ ক'দিনের বিরক্তির কারণটা যে ওই তাও বুঝতে পারছেন এখন। আগে ধরতে পারেন নি···আজও সকালে দেখা হয়েছিল লোকটার সঙ্গে—তাই সমস্ত দিন মনটা খিঁচড়ে আছে। আগে একেবারেই এটা মাথায় ঢোকেনি তার।

বেঁটে লোকটা কিন্তু ভোলবার অবসর দিলে না তাঁকে। তারপর দিনই আবার দেখা হল রাস্তায়—ওই হ্যারিসন রোড কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়েই। ঠিক তেমনি করে থমকে দাঁড়াল, ঠিক তেমনি করে' একদৃষ্টে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। "চুলোয় যাক্'—পুরন্দরবাবু ব্যাপারটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন। এক একটা লোককে দেখলে এমন বিতৃষ্ণা হয়!

ঘণ্টাখানেক পরে তাঁর আবার মনে হলো—"এর আগে লোকটাকে কোথাও দেখেছি,—সমস্ত সন্ধ্যেটা মেজাজ খারাপ হয়ে রইল। রাত্রে একটা দুঃস্বপ্নও দেখলেন। এর কারণও যে ওই লোকটা হতে পারে তা মনে হ'লো না তাঁর। সন্ধ্যা বেলা তো তার কথা একবারও ভাবেননি তিনি। আর তা ছাড়া ঐরকম একটা অপদার্থ লোক যে তাঁর মনকে এতটা অধিকার করে' থাকবে তাঁর মেজাজ খারাপ করে' দেবে' একথা স্বীকার করাও যে লজ্জাকর! দু'দিন পরে আবার তার সঙ্গে দেখা হয় একটা ভিড়ের মধ্যে। মনে হল লোকটা তাঁকে চিনতে পেরেছে যেন। তার দিকে এগিয়েও আসছিল, কিন্তু ভীড়ের জন্য পারলে না, নমস্কার করবার জন্য হাতও তুলেছিল। চীৎকার করে' ডাকলে নাম ধরে' মনে হল...পুরন্দরবাবু এটা অবশ্য ঠিক শুনতে পান নি। রাগ হল তাঁর—"কে লোকটা! আমাকে যদি চিনেই থাকে কাছে আসছে না কেন। এমনভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবার মানে কি?" একটা গাড়ি ডেকে তাতে চড়ে বসলেন। খানিকক্ষণ পরেই মামলা নিয়ে উকিলের সঙ্গে তর্কাতর্কিও করলেন খুব। সন্ধ্যাবেলা কিন্তু মন আবার অবসন্ন হয়ে পড়ল—অদ্ভুত রকম একটা অবসাদে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, "লিভারটাই খারাপ হয়েছে সম্ভবত। শরীরে জুৎ পাচ্ছি না কিছুতে..."

এই তৃতীয় সাক্ষাৎ। এর পর উপর্য্যুপরি আর দেখা হয় নি পাঁচদিন। তবু কিন্তু মন থেকে দূর হয়নি সে। পুরন্দরবাবু একথা আবিষ্কার করে'

চমকেই গেলেন একদিন—"লোকটার জন্যই শরীর খারাপ হচ্ছে না কি! অদ্ভুত তো! কি করছে ও কোলকাতায় এতদিন ধরে'! আমাকে চিনতে পেরেছে? কিন্তু, আমি কিছুতেই চিনতে পারছি না তো। উস্‌কো-খুস্‌কো চুল, করুণ চোখের দৃষ্টি। করুণ দৃষ্টি হবার মানে কি। কাছে গিয়ে ভাল করে দেখলে চিনতে পারব বোধহয়..."

বিস্মৃতি-সাগরে—তরঙ্গ উঠল যেন দু'একটা—মনে আসছে আসছে, কিন্তু আসছে না। অনেক সময় একটা নাম বা কথা যেমন মনে আসে কিন্তু মুখে আসে না, তেমনি—নাগাল পেয়েও যেন পাওয়া যাচ্ছে না।

"অনেক দিন আগে...ঠিক কোথায় যেন···ও···না-না চুলোয় যাক। কি একটা সামান্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছি..."

ভয়ঙ্কর রাগ হল। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ মনে পড়ল যে সকালে রাগ হয়েছিল। এবং 'ভয়ঙ্কর' রাগ হয়েছিল। মনে হতেই কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।···শুধু আশ্চর্য্য নয়, কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন। কি যে ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রাগ হবার কারণ কি!

"নিশ্চয়ই হেতু আছে কোন...তা না হলে কোথাও কিছুই নেই.. আশ্চয্য!" এর বেশী আর ভাবনা এগোল না সেদিন।

তার পরদিন আরও বেশী রাগ হল এবং মনে হ'ল যে রাগ হবার সঙ্গত হেতুও আছে, রাগ করে' কিছুমাত্র অন্যায় করেন নি তিনি। একি কাণ্ড! চতুর্থবার দেখা হয়েছিল বেঁটে লোকটার সঙ্গে। লোকটা একবার হঠাৎ যেন আবির্ভূত হল—মাটি ফুঁড়ে বেরুল যেন। কর্পোরেশনের মেম্বার নামজাদা উকিল বিশ্বম্ভর বোসের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল... বালিগঞ্জে এঁরই বাড়িতে অতর্কিতে সন্ধ্যেবেলা যাবেন ভেবেছিলেন... ভদ্রলোকের সঙ্গে তেমন আলাপ ছিল না...কিন্তু মকোর্দ্দমার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করার বিশেষ প্রয়োজন। অপরিহার্য্য ব্যক্তিটি কিন্তু ক্রমাগতই

পুরন্দরবাবুকে এড়িয়ে চলছিলেন। হঠাৎ তাঁরই সঙ্গে রাস্তায় দেখা! পুরন্দরবাবু কথা কইতে কইতে তাঁর পাশে পাশে হাঁটছিলেন এবং প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন তাঁকে বাগাতে। আর কিছু নয়, একটা ব্যাপারের আলোচনা-প্রসঙ্গেও ভদ্রলোক যদি দু'একটা কথা ফাঁস করে' ফেলেন— ওই দু'একটা কথা জানতে না পারলে পুরন্দরবাবুর মামলার বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। কিন্তু চতুর বৃদ্ধ উকিল ঘাড় নেড়ে মুচকি হেসে আসল ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে লাগলেন ক্রমাগত। পুরন্দরবাবুও ছাড়ার পাত্র নন। নানা যুক্তি বিস্তার করে' তিনিও জড়াবার চেষ্টা করছিলেন ভদ্রলোককে, ঠিক এই সময় সামনের ফুটপাথে হঠাৎ বেঁটে লোকটা আবির্ভূত হল। তাদের দুজনের দিকেই নির্নিমেষে চেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে...মনে হল তার চোখেমুখে একটা বিদ্রূপও ফুটে উঠেছে যেন।

উকিল ভদ্রলোককে তাঁর গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়ে পুরন্দরবাবু ভাবলেন—আঃ, কি পাপের ভোগ! ওই অপয়াটার জন্যই সব মাটি হয়ে গেল বোধ হয়। একটি কথাও বার করতে পারা গেল না! লোকটার উদ্দেশ্য কি? গোয়েন্দা নয় তো। মনে হচ্ছে পিছু নিয়েছে! কেউ লাগিয়ে দিয়েছে হয় তো...কিম্বা...কিন্তু না, ওর চোখ মুখে একটা ব্যঙ্গ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে মনে হল যেন। কাকে ব্যঙ্গ করছে? আমাকে? চাবকে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব ব্যাটার। আজই একটা হাণ্টার কিনতে হবে। না, এর বিহিত করা দরকার অবিলম্বে। কে লোকটা? জানতেই হবে, জানতেই হবে যেমন করে' হোক...।

এই চতুর্থ সাক্ষাতের তিন দিন পরে উপরোক্ত হোটেলে পুরন্দরবাবু সত্যই অত্যন্ত বিচলিত এবং অভিভূত হয়ে পড়লেন। নিজের প্রবল অহঙ্কার সত্ত্বেও ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না তিনি। আগাগোড়া সমস্ত পর্য্যালোচনা করে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে গত পনর দিনের সমস্ত অবসাদ, সমস্ত হতাশা, সমস্ত মানসিক বিকারের একমাত্র কারণ ওই

রোগা বেঁটে লোকটা! "হয়তো আমার মাথা খারাপ হয়েছে"—তাঁর মনে হল—"হয়তো তুচ্ছ একটা জিনিষকে বড় করে দেখছি···কিন্তু 'হয় তো'র ওপর নির্ভর করে এটাকে কল্পনা-বিলাস বলে' উড়িয়ে দিয়েও তো লাভ নেই! কি সুবিধে হবে তাতে! রাস্তার যে কোন বদমাস যদি এমনভাবে বিপর্য্যস্ত করে' ফেলতে পারে আমাকে—তাহলে তো···মানে তাহলে তো···"

এই পঞ্চম সাক্ষাৎটা—যা এত বিচলিত করেছিল পুরন্দরবাবুকে—ওই বেঁটে লোকটির দিক থেকে বিচার করলে খুব যে আপত্তিকর তা নয়। পুরন্দরবাবুই বরং অদ্ভুত ব্যবহার করেছিলেন। বেঁটে লোকটি বিশেষ কিছু করে নি। পুরন্দরবাবুর পাশ দিয়ে একটু দ্রুতবেগে সে চলে গিয়েছিল কেবল। তাঁর দিকে তাকায় নি, তাঁকে যে সে চিনতে পেরেছে এমনও কোন ভাব প্রকাশ করে নি, বরং চোখ নীচু করে' কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে' যথাসম্ভব দ্রুতবেগেই চলে গিয়েছিল সে। পুরন্দরবাবুই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"এই শুনছেন মশাই, পালাচ্ছেন কেন—শুনুন শুনুন—কে আপনি···"

এ রকম প্রশ্ন (বিশেষতঃ ওই চীৎকারটা) খুবই অশোভন হয়েছিল। পুরন্দরবাবু পরে সেটা হৃদয়ঙ্গমও করেছিলেন। বেঁটে লোকটা তাঁর চীৎকার শুনে একবার ঘুরে দাঁড়াল, মনে হল যেন হকচকিয়ে গেছে, তার পর হাসল একটু; পরমুহূর্ত্তেই মনে হল কি যেন বলতে চাইছে, দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে রইল দু'এক সেকেণ্ড, তারপর হঠাৎ ঘুরে ছুট দিল ঊর্দ্ধশ্বাসে। পুরন্দরবাবু সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভাবলেন—"মনে হচ্ছে ও নয় আমিই যেন গায়ে পড়ে" আলাপ করতে চাইছি। আমার অদ্ভুত আচরণ থেকে তাই বোঝায় অন্ততঃ—"

হোটেলের খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লেন তিনি বালিগঞ্জের উদ্দেশ্যে। কর্পোরেশনের সেই উকিল ভদ্রলোককে ধরতে হবে যেমন করে' হোক। গিয়ে দেখেন তিনি বাড়ি নেই। শুনলেন ধর্ম্মতলায় কোথায় যেন নিমন্ত্রণ

খেতে গেছেন কার জন্ম-তিথি উপলক্ষে। কখন ফিরবেন ঠিক নেই, রাত্রে না-ও ফিরতে পারেন। ঠিকানাটা জেনে নিলেন পুরন্দরবাবু—একবার মনে করলেন ধর্ম্মতলায় গিয়েই ধরবেন তাঁকে। কিন্তু একটু পরেই মনে হল অনিমন্ত্রিত যাওয়াটা অনুচিত হবে সেখানে। রাগ হল ভয়ানক! গাড়িটা ছেড়ে দিলেন—সুরু করলেন হাঁটতে। শ্যামবাজার অনেক দূর—হোক দূর—হেঁটেই যাবেন তিনি। শরীরটা চালনা করা দরকার। যেমন করে' হোক অনিদ্রাটা দূর করতে হবে, আজ রাত্রে অন্ততঃ ভাল ঘুম হওয়া নিতান্ত দরকার···সমস্ত দেহ মন এমন উত্তেজিত হয়ে রয়েছে···ক্লান্ত না হলে ঘুম আসবে না। হাঁটতে লাগলেন। বাড়ি এসে পৌছলেন রাত এগারটায় এবং সত্যিই তখন অত্যন্ত ক্লান্ত তিনি।

যে বাসাটা পুরন্দরবাবু ভাড়া করেছিলেন—যদিও অহরহ তার নানারকম খুঁত তাঁর চোখে পড়ত—যদিও তিনি রোজ অন্তত পঞ্চাশ বার বলতেন যে লক্ষ্মীছাড়া মকোদ্দমাটার জন্যে তাঁকে এই হতচ্ছাড়া বাসাটায় বাধ্য হয়ে বাস করতে হচ্ছে—বাসাটা কিন্তু নিতান্ত মন্দ ছিল না। দোতলায় খান-দুই চমৎকার ঘর—বাথরুম···তা ছাড়া আর একটি ছোট ঘর। পুরন্দরবাবু এটাকে নিজের পড়ার ঘর বানিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ সেখানে একটা টেবিল, খান কয়েক চেয়ার, টেবিলের উপর খবরের কাগজ, বইপত্র ছড়ানো থাকতো। পুরন্দরবাবু যে ঘরটায় শুতেন—সেটা বেশ বড় ঘর—ঠিক রাস্তার উপর। ঘরের কোণে একটা সোফা ছিল তাতেই শুতেন তিনি। ঘরের আসবাবপত্রগুলিও নেহাত খেলো নয়, যখন অবস্থা স্বচ্ছল ছিল তখনকার দিনের শৌখীন জিনিসও ছিল দু'চারটে। ভাল চীনেমাটির বাসন কিছু, ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি কয়েকটা, ভাল একখানা কার্পেট, ভাল ছবি গোটা দুই···কিন্তু সবই মলিন, ধূলিধূসরিত, এলোমেলো। তাঁর চাকর রামা বাড়ি চলে যাওয়ার পর থেকে চারদিক আরও যেন অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। রামা ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। দারোয়ানের ভাই হরির তার বদলে কাজকর্ম্ম

করে দেওয়ার কথা। সেই আশায় তিনি যখন বাইরে যান, ঘরের চাবি দারোয়ানের কাছে রেখে যান। হরি কিন্তু মাইনেটি নেওয়া ছাড়া আর কিচ্ছু করে না। পুরন্দরবাবুর মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ছোঁড়ার হাতটানও আছে সম্ভবত। কিন্তু সবই তিনি সহ্য করেন—যা হয় হোক! বেশ তো আছেন একা একা! একা কিন্তু থাকারও একটা সীমা আছে। মাঝে মাঝে অসহ্য বোধ হত। বিশেষতঃ ঘরে ফিরে যখন দেখতেন—চতুর্দ্দিক অপরিচ্ছন্ন, বিছানা অগোছালো, টেবিলে, চেয়ারে, ছবিতে, আয়নায় ধূলো জমে আছে।

সেদিন কিন্তু এসব কিচ্ছু হ'ল না। জুতো জামা খুলেই সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ঘুমুতে হবে···বাজে চিন্তা করে' সময় নষ্ট করা হবে না···। বালিশে মাথা রাখা মাত্রই ঘুমিয়েও পড়লেন। এ রকম আশ্চর্য্য ঘটনা গত এক মাসের মধ্যে ঘটে নি।

তিন ঘণ্টা ঘুমোলেন তিনি। গভীর ঘুম কিন্তু নয়। স্বপ্ন দেখলেন নানারকম। অদ্ভুত সব স্বপ্ন—লোকে জ্বরের ঘোরে যেমন স্বপ্ন দেখে অনেকটা তেমনি। যেন তিনি একটা কুকর্ম্ম করে লুকিয়ে আছেন—লোকে তা জানতে পেরেছে···দলে দলে তাঁর দিকে আসছে সব। প্রকাণ্ড ভীড় জমে গেছে একটা। কিন্তু আসছে, ক্রমাগতই আসছে। ঘরের কপাট বন্ধ করা যাচ্ছে না···ভীড়ের মধ্যে তিনি কিন্তু একদৃষ্টে একটি লোককেই দেখছিলেন কেবল—তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু একজন, অনেকদিন আগে মারা গেছে···এ হঠাৎ এল কি করে! আর সব চেয়ে বিব্রত বোধ করছিলেন তার নাম মনে না করতে পেরে। কিছুতেই নামটা মনে পড়ছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল খুব ভালবাসতেন তাকে। সমস্ত জনতাও যেন তারই মুখের দিকে চেয়েছিল—সেই যেন ঠিক করে' দেবে পুরন্দর দোষী না নির্দ্দোষ···সবাই যেন অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। সে কিন্তু নির্ব্বাক হয়ে টেবিলের ধারে চুপ করে' বসেছিল। কিছুতেই কথা বলবে না। গোলমাল বাড়তে লাগল, অস্থির হয়ে উঠছে সবাই···সে কিন্তু নির্ব্বাক।

এ নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠল পুরন্দরবাবুর পক্ষে···তিনি উঠে ঠাস করে' একটা চড় মারলেন তাকে চুপ করে থাকার জন্য। আর মেরে যেন উপভোগ করলেন সেটা। ভয় হল, দুঃখ হল, যা করলেন তার জন্যে শিউরে উঠলেন মনে মনে—কিন্তু শিহরণটাও উপভোগ করলেন যেন। উত্তেজিত হয়ে—আবার মারলেন তাকে, আর একবার, আর একবার, আর একবার···রাগে, ক্ষোভে, আতঙ্কে যেন বুঁদ হয়ে গেলেন, শেষে উন্মাদ হয়ে উঠলেন, উন্মাদনার অন্তরালে অদ্ভুত একটা আনন্দও যেন শির শির করে' বইতে লাগল শরীরের শিরা-উপশিরায়···ক্রমাগত মেরে যেতে লাগলেন ··যেন থামতে পারছেন না। মনে হতে লাগল নিঃশেষ করে ফেলি সব—চুরমার করে ফেলি সমস্ত। হঠাৎ বিপর্যয় ঘটে গেল একটা। সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে খোলা দরজাটার দিকে ছুটল কিসের প্রত্যাশায় যেন···আর সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক বেলটা বেজে উঠল। তিন বার বাজল··· ঝন-ঝন ঝন-ঝন ঝন-ঝন···ঝনাৎকারের চোটে আকাশ ভেঙে পড়বে যেন। পুরন্দরবাবুর ঘুম ভেঙে গেল···তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটলেন তিনিও। ইলেকট্রিক বেলটা স্বপ্ন নয়—তার মনে হল—সত্যিই এসেছে কেউ। এমন তীক্ষ্ণ প্রবল ঝনাৎকার স্বপ্ন হতে পারে না কিছুতে···।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এটাও স্বপ্ন। দরজাটা খুললেন, সিঁড়ির কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলেন পর্য্যন্ত। কোথাও কেউ নেই। আশ্চয্য লাগল বটে, কিন্তু আরামও পেলেন মনে মনে। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন, তার পর মনে হল কপাটে খিল দেন নি। ফিরে দেখলেন একবার, না খিল দেন নি, ভেজান আছে। আগেও অনেকবার রাত্রে ফিরে ঘরে খিল দিতে ভুলেছেন তিনি। কি আর হবে—থাক। ঘড়িতে আড়াইটে বাজার শব্দ হল।···তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন তাহলে।

স্বপ্ন দেখে মনটা এমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে আর শুতে ইচ্ছে হল না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। জানালার কাছে গিয়ে পরদাটা সরিয়ে দিলেন। গ্রীষ্মকালের রাত্রি শেষ হয়ে এল প্রায়—ভোরের আভাস দেখা যাচ্ছে। স্বপ্নটা কিন্তু কিছুতেই তাড়াতে পারছিলেন না মন থেকে। ওই লোকটাকে তিনি যে মেরেছেন—মারা যে সম্ভব হল তাঁর পক্ষে—এই অনুভূতিটাই কষ্ট দিচ্ছিল তাঁকে। কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলেন না।

"ও রকম লোক নেই, কেউ ছিল না, থাকতে পারে না···ওটা শুধু স্বপ্ন। কেন মাথা ঘামাচ্ছি এ নিয়ে!"

যতই নিজেকে বোঝাতে লাগলেন ততই উত্তেজনা বাড়তে লাগল, ততই যেন মনে হতে লাগল তাঁর সমস্ত কষ্টের মূল কারণ এ ছাড়া আর কিছু নয়··· আসন্ন একটা বিপদ যেন ঘনিয়ে আসছে।

ক্রমশঃ বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল হয়ে পড়ছেন এ কথা ভাবলে কষ্ট হত তাঁর। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেলে নিজেকে আরও কষ্ট দেবার জন্য নিজের বার্দ্ধক্য এবং দৌর্ব্বল্যকেই বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতেন তিনি।

"জরা"—মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলেন তিনি—"হাঁ! জরাই। জরা ছাড়া আর কি। শরীরে শক্তি নেই—স্মরণ শক্তিও নেই···তাছাড়া ভূত দেখছি···অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখছি···স্বপ্নে ঘণ্টা বাজছে! চুলোয় যাক···চুলোয় যাক···একটা অসুখ করবে আর কি···অসুখেরই পূর্ব্বলক্ষণ এ সব। ওই বেঁটে লোকটাও স্বপ্ন সম্ভবতঃ কাল যা ভাবছিলাম, আমিই তার পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি, সে কিছু করে নি···সবই আমার সৃষ্টি। নিজেই ভূত সৃষ্টি করছি, নিজেই তার ভয়ে টেবিলের তলায় লুকোচ্ছি। আশ্চর্য্য—তার ওপর রাগই বা হচ্ছে কেন, ছোটলোকই বা বলছি কেন তাকে মিছিমিছি! হয় তো খুবই ভদ্রলোক সে আসলে। দেখতে ভাল নয়। বেঁটে—তাতে হয়েছে কি··· পোষাক পরিচ্ছদ ভদ্রলোকের মতই। কিন্তু লোকটার চোখের দৃষ্টিতে কি যেন একটা আছে···ওই, আবার সুরু করেছি। তার কথা বার বার ভাববার

দরকার কি। তার চোখের দৃষ্টিতে কি আছে তা আবিষ্কার ক'রে কি হবে আমার ঘোড়ার ডিম! ও ছাড়া কি আর ভাববার কিছু নেই!…"

হঠাৎ একটা কথা ভেবে মনের ভেতরটা খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। হঠাৎ তাঁর বিশ্বাস হল ওই বেঁটে লোকটা তাঁর পূর্ব্বপরিচিত—শুধু পূর্ব্বপরিচিত নয়, তাঁর জীবনের কোন গোপন কথা জানা আছে ওর, তাই দেখা হলেই চোখে ওই দৃষ্টি ফুটে ওঠে।

জানালাটা ভাল করে' খুলে দেবার জন্যে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভাবলেন বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকুক একটু, আর—হঠাৎ আপাদমস্তক শিউরে উঠল তাঁর…মনে হল অসম্ভব একটা ব্যাপার চোখের সামনে ঘটছে যেন।

জানালাটা তখনও ভাল করে' খোলেন নি তিনি। চট্‌ করে' সরে' এসে জানালার একধারে লুকিয়ে পড়লেন। ঠিক জানালার সামনে ওদিকের শূন্য ফুটপাথে সেই বেঁটে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর জানালার দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পায় নি বোধ হয় তাঁকে, ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবছে কি যেন…ভাবছে কিন্তু ঠিক করতে পারছে না…হাতটা তুলে কপালে বুলিয়ে নিলে একবার। আর দ্বিধা রইল না…ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে একবার, তারপর চোরের মতো পা টিপে টিপে রাস্তাটা পার হতে লাগল। হ্যাঁ, এই বাড়িতেই ঢুকছে। গলিটার দিকে গেল…

"আমার কাছেই আসছে"—চকিতে মনে হল পুরন্দরবাবুর এবং তিনিও পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন। ভেজান দরজাটার সামনে স্তব্ধ উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন…সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া যাবে এখনই।

বুকের ভিতর এমন কাঁপছিল। লোকটা পা টিপে টিপে যদি আসে কোন শব্দই শুনতে পাবেন না হয়তো। কি যে হচ্ছিল তা যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারছিলেন না একটুও, কিন্তু শতগুণ অনুভব করছিলেন সমস্ত সত্তা দিয়েই। স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হচ্ছে। পুরন্দরবাবু সাহসী লোক। অনেক সময়

অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি—লোকের কাছে বাহাদুরি পাওয়ার জন্যে নয়—নিজেকে পরীক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু এখন যা হ'ল তাতে সাহস ছাড়া আরও কিছু ছিল। যিনি একটু আগে স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগছিলেন তিনি সহসা সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। অন্য লোক যেন! একটা নীরব অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। বদ্ধ দ্বারের ভিতর দিয়েই তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন।

"ওই আসছে, এসে পড়ল, চারিদিকে চেয়ে দেখছে, কান পেতে শুনছে কি যেন দম বন্ধ করে'—উঠছে এইবার···ওই। কপাটের কড়াতে হাত দিয়েছে··"

তিনি যা ভাবছিলেন ঠিক তাই হয়েছিল; দরজার ওপারে সত্যিই একজন দাঁড়িয়েছিল এসে, কড়াতে হাতও দিয়েছিল নিঃশব্দে। পুরন্দরবাবু আর থাকতে পারলেন না, কেমন যেন অদ্ভুত উন্মাদনা একটা পেয়ে বসল তাঁকে। হঠাৎ কপাটটা খুলে ফেললেন। সেই বেঁটে লোকটা দাঁড়িয়েছিল।

নির্ব্বাক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল আরও খানিকক্ষণ নিস্পন্দভাবে। হঠাৎ পুরন্দরবাবু তাকে চিনতে পারলেন। সে-ও যেন বুঝতে পারলে যে পুরন্দরবাবু তাকে চিনেছেন। তার চোখের দৃষ্টি থেকেই বোঝা গেল তা। হঠাৎ স্নিগ্ধ হাসিতে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার।

"পুরন্দরবাবু আশা করি চিনতে পেরেছেন আমাকে"—গাঢ়কণ্ঠে অত্যন্ত আবেগভরে কথাগুলো বলল সে। কেমন যেন খাপছাড়া শোনাল।

"যুগল পালিত না কি"—

পুরন্দরবাবুও একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

"ন'বছর আগে বর্দ্ধমানে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই হয়েছিল, মনে আছে আশা করি আপনার"—

"হ্যাঁ···নিশ্চয়। কিন্তু এখন রাত তিনটে। আপনি আমার বন্ধ দরজার

সামনে দশ মিনিট ধরে' দাঁড়িয়ে আছেন কড়ায় হাত দিয়ে, এর মানেটা বুঝতে পারছি না ঠিক—"

"রাত তিনটে! বলেন কি"—পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখে যুগল শুধু বিস্মিত নয় একটু আহত হল যেন—"তাই তো, তিনটেই দেখছি। আমায় মাপ করুন পুরন্দরবাবু, সিঁড়িতে ওঠবার আগে ঘড়িটা আমার দেখা উচিত ছিল। বড় লজ্জিত হলাম, আবার একদিন আসব তখন বলব সব, দু' একদিনের মধ্যেই আসব, এখন যাই।"

"সব বলতেই যদি চান এখনই বলুন"—পুরন্দরবাবু তার হাত ধরলেন—"আসুন, ভিতরে আসুন। ভিতরে আসবারই ইচ্ছে ছিল নিশ্চয় আপনার, তা না হলে এত রাত্রে শুধু শুধু এত কষ্ট করে এলেন কেন? কিছু একটা উদ্দেশ্য ছিলই—বলুন কি সেটা—"

তিনি উত্তেজিতও হয়েছিলেন, হতাশও হয়েছিলেন, ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছিলেন না। একটু লজ্জাও করছিল…রহস্য, বিপদ কিছুই তো নয়। কল্পনায় যেটাকে বিভীষিকাময় করে তুলেছিলেন একটু আগে তা কিছুই নয়—নিরীহ যুগল পালিতে পরিণত হল শেষ পর্য্যন্ত! কিন্তু না, এত সরল নয় ব্যাপারটা। একটা অস্পষ্ট আশঙ্কার হাত এড়াতে পারছিলেন না তিনি।

যুগল পালিতকে ইজিচেয়ারে বসিয়ে, পাশেই বিছানায় গিয়ে বসলেন তিনি। দুই হাঁটুর উপর হাত রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসলেন। লোকটা কি বলে শোনাই যাক। আপাদমস্তক ভাল করে' দেখলেন আর একবার। ভাল করে মনে পড়ল সব। যুগল পালিত কিন্তু চুপ করে বসে রইল। একটি কথাও বলে না। আগত সে যে তার অদ্ভুত আচরণের জবাবদিহি করতে বাধ্য একথা যেন তার মাথাতেই আসছে না। বরং সে এমনভাবে পুরন্দরবাবুর দিকে চাইতে লাগল যেন পুরন্দরবাবুই কিছু বলবেন। হয়তো ভয় পেয়েছিল। ফাঁদে পড়লে ইঁদুর যেমন হকচকিয়ে যায় তেমনি হয়েছিল হয়তো। পুরন্দরবাবু কিন্তু রেগে উঠলেন।

"এরকম করার মানেটা কি! আপনি ভূতও নন স্বপ্নও নন নিশ্চয়, মতলবটা কি খুলেই বলুন না···"

যুগল পালিত উশখুস করতে লাগল। তারপর একটু মুচকি হেসে একটু থেমে থেমে বলল—"আমি যতদূর বুঝতে পারছি তাতে এ সময়ে এবং এ ভাবে আসাটা অদ্ভুতই মনে হচ্ছে আপনার···যদিও অতীতের কথা মনে করলে, কি ভাবে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল তা ভাবলে ···এটা অবশ্য ঠিক এ সময়ে আসব ভাবি নি আমি···পাকেচক্রে হয়ে গেল···"

"পাকেচক্রে মানে! জানালা দিয়ে আমি স্বচক্ষে দেখলাম যে আপনি পা টিপে টিপে আমার ঘরের দিকে চাইতে চাইতে রাস্তাটা পার হলেন।"

"ও, আপনি দেখেছিলেন তাহলে! তাহলে আপনিই তো আমার চেয়ে বেশী জানেন। কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করছি বোধ হয়···দেখুন তিন হপ্তা আগে আমি এখানে এসেছি, নিজের একটা কাজে। আমি যুগল পালিত আপনি তো জানেনই, চিনতেই তো পারলেন। আমি এখানে এসেছি চাকরির তদ্বির করতে। বদলি হতে চাই আমি। খুব ভাল পোষ্ট খালি হয়েছে একটা, ঢের বেশী মাইনে···কিন্তু সে চাকরি এখানে নয় যেখানে ছিলাম সেখানেও নয়, যদিও···মোট কথা আসল ব্যাপারটা হচ্ছে—গত তিন সপ্তাহ ধরে' এই কোলকাতা শহরে ঘুরে ঘুরে' বেড়াচ্ছি। কাজটা ওজুহাত মাত্র, ঘুরে বেড়াচ্ছি এইটেই আসল কথা।—চাকরিটা যদি হয়ও খুব যে ধন্য হয়ে যাব তা নয়, তখনও হয়তো এমনি ভাবে ঘুরে বেড়াব রাস্তায় রাস্তায় এখন যেমন ঘুরছি। জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছি পুরন্দরবাবু। আর দেখুন হারিয়ে ফেলেছি বলে' খুশীই হয়েছি মনে হচ্ছে—মানে আমার যা মনে হচ্ছে তাই বলছি আপনাকে—এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে হয়তো, মাপ করবেন—"

"কি রকম মনে হচ্ছে?" পুরন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

যুগল পালিত নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে। তারপর গাঢ়স্বরে বলল, "সে আর নেই—"

পুরন্দরবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্ত্ত। তারপর হঠাৎ তাঁর কান দুটো গরম হয়ে উঠল, বুকের ভিতরটা মুচড়ে দিলে কে যেন।

"কে! মিসেস পালিত?"

"হ্যাঁ। অপর্ণা গত ফাল্গুন মাসে মারা গেছে···যক্ষ্মা হয়েছিল। দু'তিন মাস ভোগবার পর হঠাৎ বাড়াবাড়ি হল একদিন। আমাকে ফেলে চলে গেল। কি অবস্থায় ফেলে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন।"

হতাশা-ব্যঞ্জক ভঙ্গীতে যুগল পালিত নিজের বাহুযুগলকে দুপাশে প্রসারিত করে' মাথাটা নীচু করে রইল। পুরন্দরবাবু দেখলেন টাক পড়েছে লোকটার।

যুগলবাবুর কথা শুনে এবং ভাব-ভঙ্গী দেখে পুরন্দরবাবু যেন চাঙ্গা হলেন খানিকটা। একটা শ্লেষতিক্ত নির্মম হাসির আভাসও যেন খেলে গেল ঠোঁটে···কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্য। যে মহিলাটির মৃত্যু সংবাদ এইমাত্র শুনলেন তাকে অনেকদিন আগে তিনি চিনতেন, অনেকদিন আগে ভুলেও ছিলেন। তার মৃত্যু সংবাদে এতটা বিচলিত হয়ে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন।

"তাই না কি!···আমাকে এতদিন খবরটা দেন নি কেন? দেওয়া উচিত ছিল। সত্যি বিশ্বাস হচ্ছে না—"

"আপনার সহানুভূতির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সহানুভূতি যে মেকি নয় তাও জানি। যদিও···"

"যদিও?"

"যদিও আপনার সঙ্গে অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়েছে—কিন্তু আপনি আমার দুঃখে এ রকম বিচলিত হলেন কি করে' যে, বিশ্বাস করুন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ভাষা পাচ্ছি না। অন্য বন্ধুদের সম্বন্ধেও আমার ওই এক কথা—

—ভাষা পাচ্ছি না—এই তো এখানেই পূর্ণ গাঙুলী রয়েছেন—অকৃত্রিম বন্ধু একজন। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয়—আমি বন্ধুত্বই বলি সেটাকে, আমার স্পর্দ্ধা মাপ করবেন—আপনার সঙ্গে পরিচয় ন'বছর আগে, তারপর যদিও আপনি আর যান নি আমাদের কাছে, চিঠিপত্রও লেখেন নি···"

লোকটা সুর করে গান গাইছে যেন। আর সর্ব্বদা চোখ নীচু করে মাটির দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে কিছুই তার দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। সব লক্ষ্য করে চলেছে।

পুরন্দরবাবু ইতিমধ্যে একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। সকৌতুকে এবং সবিস্ময়ে যুগল পালিতকে লক্ষ্য করছিলেন তিনি। তার সব কথা শুনছিলেন। হঠাৎ সে যখন থেমে গেল তখন অসংলগ্ন কয়েকটা কথা তাঁর মনে হল।

"আচ্ছা, এর আগে আপনাকে চিনতে পারি নি কেন বলুন তো!"—হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—রগের শিরাগুলো দপ দপ করে উঠল তাঁর—"অন্তত পাঁচবার রাস্তায় দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে"—

"হ্যাঁ; আমারও মনে আছে তা। আপনার সঙ্গে কয়েকবারই দেখা হয়েছিল—দু'বার, কিম্বা তিনবার বোধ হয় আপনি এসে পড়েছিলেন আমার সামনে"—

"আপনিই এসে পড়েছিলেন বলুন। আমি একবারও যাই নি ইচ্ছে করে—"

পুরন্দরবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে হেসে উঠলেন। যুগল পালিত থেমে গেল, পুরন্দরবাবুর দিকে এক নজর চেয়ে বলল—"আমাকে চিনতে না পারার ঢের কারণ আছে। প্রথমত হয়তো আমাকে ভুলেই গিয়েছিলেন, ভুলে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়—তা ছাড়া আমার বসন্ত হয়েছিল, মুখে দাগ হয়ে গেছে···"

"ও! বসন্ত হয়েছিল না কি! বসন্ত কি করে—"

"বাগালাম? আরও কত কি হতে পারত। কিছু কি বলা যায়, মশাই! অদৃষ্ট মন্দ হলে সবই হতে পারে—'

"তা বটে, তা বটে। বলুন কি বলছিলেন—"

"আমিও অবশ্য আপনাকে দেখেছিলাম রাস্তায়—"

"আচ্ছা—আপনি হঠাৎ 'বাগালাম' বললেন কেন! আমি কথাটা ঠিক ও রকম ভাবে বলতে চাই নি। আচ্ছা থাক ও কথা, যা বলছিলেন বলুন—" তাঁর মনে যেন প্রসন্নতা ফিরে আসছিল। ধাক্কাটা সামলে নিয়েছিলেন। উঠে পায়চারি করতে স্বরু করলেন।

"যদিও আমি আপনাকে রাস্তায় দেখেছিলাম, কোল্‌কাতায় আসবার সময়ই যদিও আমি ভেবেছিলাম যে আপনার সঙ্গে দেখা করব—কিন্তু সত্যি কথা বলছি, মনটা এমন ভেঙে গেছে···ফাল্গুন মাস থেকে বুকটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সত্যি বলছি—"

"ও—কি বললেন—চুরমার হয়ে গেছে? আচ্ছা এক মিনিট—সিগারেট খান আপনি কি···"

"আপনি তো জানেন, আগে অপর্ণা যখন বেঁচেছিলেন তখন আমি···"

"হ্যাঁ, আগে তো খেতেন। ফাল্গুনের পর থেকে ছেড়ে দিয়েছেন বুঝি"?

"এক আধটা খাই কখনও কখনও।"

"নিন তাহলে একটা। এই যে দেশলাই—ধরিয়ে নিন। তার পর বলুন—বলে যান—এ যে অত্যন্ত, মানে—"

পুরন্দরবাবু নিজেও একটা সিগারেট ধরালেন এবং বিছানার উপর বসলেন।

যুগল পালিত চুপ করে' রইল খানিকক্ষণ।

"আপনি বড় বিচলিত হয়েছেন মনে হচ্ছে। আপনার শরীর ভাল আছে তো?"

"চুলোয় যাক আমার শরীর"—হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন পুরন্দরবাবু—"আপনি বলে যান—"

যুগল পালিত পুরন্দরবাবুকে বিচলিত হতে দেখে একটু যেন খুশী হল। আত্মপ্রত্যয় যেন বেড়ে গেল তার।

"কিন্তু বলবার আর কি আছে? ভেবে দেখুন, আমার সমস্ত জীবনই নষ্ট হয়ে গেল—মানে সমূলে নষ্ট হয়ে গেল। কবিত্ব নয়, ভেবে দেখুন, কুড়ি বছর বিবাহিত জীবন যাপন করবার পর উদ্দেশ্যহীন হয়ে এ ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো—কোলকাতা শহর নয়—মনে হচ্ছে যেন একটা অরণ্য। সব যেন গুলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল—সব শূন্য। শূন্যতাটাই পেয়ে বসেছে যেন আমাকে। এ অবস্থায় কোন চেনাশোনা লোকের সঙ্গে, এমন কি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে পাশ কাটিয়ে সরে পড়াটাই স্বাভাবিক। অন্য সময় আবার অন্য রকম হয়—সব মনে পড়ে যায়, সকলের সঙ্গ পেতে ইচ্ছে করে, বিশেষ করে' যে সময় চিরকালের জন্যে চলে' গেছে সেই সময় যারা ছিল তাদের সঙ্গ।...মাঝে মাঝে এত ইচ্ছে করে সেই অতীতকে ফিরে পেতে, সেই অতীতের যারা সাক্ষী ছিল তাদের কাছে যেতে...বুকের ভেতরটা এমন করতে থাকে যে তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। রাত দুপুরেও—হ্যাঁ, অন্যায় জেনেও—রাত দুপুরেও বন্ধুর কাছে যেতে তখন বাধে না...রাত তিনটের সময় তার ঘুম ভাঙিয়েও তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে ইচ্ছে করে ...সময়টা অবশ্য ঠিক করতে পারি নি...সে বিষয়ে ভুল হয়েছে আমার...কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব বিষয়ে ভুল করি নি আমি। এই যে আপনার সঙ্গে কথা কইছি এইতো যথেষ্ট, এইতেই সমস্ত ক্ষতিপূরণ হয়েছে বলে মনে করি। সত্যি আমি ভেবেছিলাম বড় জোর বারোটা বেজেছে...এখনও আমার বারোটার বেশী মনে হচ্ছে না। দুঃখের নেশায় বুঁদ হয়ে গেছি, বুঝলেন—দিগ্বিদিক জ্ঞান আর নেই। ঠিক দুঃখও নয়, বুঝলেন...জিনিসটার অভিনবত্ব বিহ্বল করে তুলেছে আমাকে—"

পুরন্দরবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে পড়েছিলেন, কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল তাঁকে। বিষণ্ণ কণ্ঠেই তিনি বললেন—"ভারী অদ্ভুত তো—"

"সত্যিই অদ্ভুত হয়ে গেছি আমি যে—"

"ঠাট্টা করছেন না আশা করি—"

"ঠাট্টা!" শুধু বিস্ময় নয়, যুগল পালিতের চোখের দৃষ্টিতে বেদনাও ঘনিয়ে এল—"এ কি ঠাট্টা করবার বিষয়! যার মৃত্যুর কথা বলছি—"

"থাক—ও কথা আর বলবেন না—"

পুরন্দরবাবু উঠে পড়লেন এবং আবার পায়চারি সুরু করলেন।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল। যুগল পালিত যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই পুরন্দরবাবু প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—"যাবেন না, বসুন, বসুন, বসুন—"

বাধ্য বালকের মতো যুগল বসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। পুরন্দরবাবু হঠাৎ তার সামনে থেমে বললেন…"সত্যি, আপনার কি ভীষণ পরিবর্তন হয়েছে—"

যেন পরিবর্তনটা হঠাৎ এখনই চোখে পড়ল তাঁর।

"ভয়ানক পরিবর্তন হয়েছে। অসাধারণ। অন্য লোক হয়ে গেছেন একেবারে—"

"তা আর বিচিত্র কি। ন' বছরে—"

"না ফাল্গুন থেকে?"

"হি হি"—হাসি চেপে যুগল পালিত বললে—"না, তা নয়। আচ্ছা, জিগ্যেস করতে পারি কি—ঠিক কি পরিবর্তনটা দেখছেন আমার—"

"একথা জিগ্যেস করছেন আপনি! যে যুগল পালিতকে আমি জানতাম তিনি বেশ শক্ত সমর্থ সৌখীন লোক ছিলেন, বেশ বুদ্ধিমান…এখন যাঁকে দেখছি তাঁকে তো মনে হচ্ছে একটা ভাঁড় মাত্র।"

পুরন্দরবাবু বিরক্তির সেই সীমায় উপনীত হয়েছিলেন যে সীমায় গম্ভীর লোকেরও রসনার রাশ টেনে রাখা শক্ত হয়।

"ভাঁড় ? তাই আপনার মনে হচ্ছে ? এখন আর বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে না আমাকে ? সত্যি ?"

যুগল পালিতের মুখে ব্যঙ্গ-দীপ্ত হাসি ফুটে উঠল একটা। মনে হল কি একটা যেন মনে মনে উপভোগ করছেন তিনি।

"বুদ্ধিমান ? না,—তবে চতুর মনে হচ্ছে বটে—মানে অতি-চতুর—" বলেই পুরন্দরবাবু ভাবলেন মনে মনে, "অশিষ্টতা হচ্ছে···কিন্তু এ লোকটাও কম অশিষ্ট নয় কি···রাতদুপুরে এমন—তা ছাড়া এর উদ্দেশ্যই বা কি···"

"ছি ছি কি বলছেন পুরন্দরবাবু, আপনি হলেন পুরানো বন্ধু একজন"—যুগল পালিতের চোখে মুখে নিখুঁত আন্তরিকতা ফুটে উঠল যেন—চেয়ারে ঘুরে বসল সে।

"কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বলুন তো ! আমরা কি এখন পৃথিবীতে আছি ? সামাজিক গণ্ডী কি এখন বেঁধে রেখেছে আমাদের ? আমরা দুজন বন্ধু, অনেক-দিনের পুরোনো বন্ধু, বহুকাল পরে একসঙ্গে মিলেছি, মন খুলে কথা বলছি, আমাদের অমূল্য বন্ধুত্বের যে প্রাণ-স্বরূপ ছিল তার কথাই স্মরণ করছি···"

কথা বলতে বলতে অভিভূত হয়ে পড়ল সে। মাথা নীচু করে' দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে' বসে রইল খানিকক্ষণ। পুরন্দরবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে। তাঁর সমস্ত চিত্ত ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভরে' উঠল। কেমন যেন একটা অস্বস্তিও ভোগ করতে লাগলেন তিনি।

"হয়ত ভাঁড় ছাড়া আর কিছু নয়"—আবার মনে হল তাঁর—"কিন্তু না। মদ খায় নি তো ? না—তাও নয়। কিছু বিচিত্র নয় অবশ্য। মুখটা লাল হয়ে আছে বেশ। মদও যদি খেয়ে থাকে—ব্যাপার একই দাঁড়াচ্ছে। ওর উদ্দেশ্যটা কি ? কি চায় ও ?"

"মনে আছে আপনার, মনে আছে"—হঠাৎ মুখ থেকে হাত সরিয়ে যুগল পালিত আবার সুরু করলে···"সেই যে আমরা একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম মহিম মল্লিকদের জমিদারিতে—সেই বাচ খেলা, হৈ হৈ করা, গান হল্লোড়—

সন্ধ্যের সময় সেই যে আপনি রবি ঠাকুরের কবিতা পড়ে শোনাতেন—নিরুদ্দেশ যাত্রা—'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি'—মনে আছে সে সব? আপনার সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপের কথাটা মনে আছে? আপনি কি একটা বৈষয়িক দরকারে এসেছিলেন আমার কাছে···বসবার ঘরে আপনার সঙ্গে আলাপ করছিলাম আমি—অপর্ণা এসে ঢুকল—বাস্—ঠিক তার দশ মিনিটের মধ্যেই আপনি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লেন। সমস্ত পরিবারের বন্ধু হয়ে গেলেন, আর সত্যিকারের বন্ধু। ঠিক এক বৎসর অন্তরঙ্গতাটা বজায় ছিল—ঠিক এক বছর—রবি ঠাকুরের চিত্রাঙ্গদার অর্জ্জুনের মতো—"

পুরন্দরবাবু মাটির দিকে চেয়ে পদচারণ করছিলেন ধীরে ধীরে। অধীর চিত্তে শুনছিলেন—সমস্ত মন ঘৃণায় ভরে উঠছিল—তবু শুনছিলেন—হ্যাঁ, বেশ মন দিয়েই শুনছিলেন।

"অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদার কথা আমার কখনও মনে হয় না তো" অপ্রতিভভাবে হঠাৎ বলে উঠলেন তিনি, "তাছাড়া আপনি অমন চীৎকার করে' কথা বলছেন কেন, আগে তো আপনি অত চেঁচাতেন না···এমন অস্বাভাবিক ভাষাও ব্যবহার করতেন না। এমন করবার মানেটা কি—"

"হ্যাঁ, আগে আমি কথা কম কইতাম, মানে গম্ভীর ছিলাম"—যুগল পালিত বলে' উঠল সঙ্গে সঙ্গে—"আগে আমি কথা শুনতেই ভালবাসতাম। সে বলত আমি শুনতাম। আপনার মনে আছে বোধ হয় কি সুন্দর কথা বলত সে—কি চমৎকার রস দিয়ে দিয়ে। আর চিত্রাঙ্গদার কথা আপনি যা বলছেন তা ঠিক—আপনার মনে থাকবার কথা নয়—আমাদেরই মনে হয়েছিল, তা নিয়ে আলোচনাও করেছিলাম, কিন্তু আপনি চলে আসবার পর। অর্জ্জুন যেমন হঠাৎ এল হঠাৎ চলে গেল···"

"কি অর্জ্জুন অর্জ্জুন করছেন" পুরন্দরবাবু মাটীতে পা ঠুকে থমকে উঠলেন। তাঁর মনে এমন একটা বিশ্রী স্মৃতি জাগছিল!

"আমাদের কিন্তু মনে হয়েছিল অর্জ্জুনের কথা" অতিশয় মধুমাখা কণ্ঠে যুগল পালিত আবার বললে, "বিশেষ করে' পূর্ণবাবু যখন এলেন—আপনি যেভাবে এসেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই এলেন। তিনি পাঁচ বচ্ছর ছিলেন।"

"পূর্ণবাবু? মানে? পূর্ণবাবু কে?

পুরন্দরবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমস্ত শরীরটা জমে' গেল যেন।

"পূর্ণচন্দ্র গাঙ্গুলী। আপনি চলে আসবার এক বছর পরে তিনিও কৃপা করে আমাদের সাহচর্য্য দান করেছিলেন ঠিক আপনারই মতো"—

"ও হ্যাঁ—ঠিক তো—মনে পড়ছে"—পুরন্দরবাবু আত্মসম্বরণ করে' বললেন, "পূর্ণবাবু! ঠিক—তিনি তো বদলি হয়ে গিয়েছিলেন ওখানে"—

"হ্যাঁ, বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। কমিশনার সাহেবের অফিসে। এখান থেকেই গিয়েছিলেন। চমৎকার লোক, ভাল বংশের ছেলে—"

যুগল পালিত যেন গদগদ হয়ে পড়ল একেবারে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু কি ভাবছিলাম—ও—হ্যাঁ তিনিও তো···"

"হ্যাঁ তিনিও, তিনিও—" পুরন্দরবাবু অসতর্ক মুহূর্ত্তে যে কথাটা বলে ফেলেছিলেন যুগল পালিত সোল্লাসে তাই পুনরাবৃত্তি করল···"হ্যাঁ তিনিও। তিনি থাকতে আমরা চিত্রাঙ্গদাটা অভিনয়ও করেছিলাম একবার। আমাকে কিন্তু অর্জ্জুনের ভূমিকায় নামতে দেয় নি—অপর্ণাই দেয় নি—"

"কি মুশকিল! আপনার অর্জ্জুন হবার যোগ্যতা কোথায়—আপনি হলেন নিখাদ যুগল পালিত"—বিরক্তিভরে রূঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন পুরন্দরবাবু—রাগে বিরক্তিতে কাঁপছিলেন তিনি—"ক্ষমা করবেন···ও পূর্ণবাবু—পূর্ণবাবু তো এখানেই আছেন—তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল আমার। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন না। যান নি সেখানে?"

"গেছি বই কি। গত পনর দিন থেকে প্রত্যহ যাচ্ছি। কিন্তু দেখা হচ্ছে না। আমাকে ঢুকতেই দিচ্ছে না কেউ। তাঁর অসুখ, শোনা কথা

নয়, নিজে গিয়ে খোঁজ করে জেনেছি তাঁর অসুখ। শক্ত অসুখ। ছ' বছরের বন্ধু। উঃ—সত্যি বলছি পুরন্দরবাবু, মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে করে ভগবতী বসুন্ধরে দ্বিধা হও—সত্যি বলছি। আবার মাঝে মাঝে অতীতটাকে আঁকড়ে ধরতেও ইচ্ছে করে—অতীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা ছিল সবাইকে—আবার কখনও কাঁদতে ইচ্ছে হয়, অন্য কোন কারণে নয়, কেবল খানিকটা হালকা হবার জন্যে…"

"আচ্ছা, আজ তাহলে আসুন। আজকের মতো অন্তত যথেষ্ট হয়েছে—কি বলেন"

পুরন্দরবাবু হঠাৎ বলে বসলেন।

"যথেষ্ট, যথেষ্ট"—যুগল পালিত উঠে দাঁড়াল—"চারটে বাজে, স্বার্থপরের মতো আপনাকে এভাবে…ছি ছি…"

"শুনুন, আমি গিয়ে দেখা করব আপনার সঙ্গে এর পরে। তারপর আশা করি—আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, সত্যি করে' বলুন, আপনি কি মদ খেয়েছেন ?"

"মদ ? মোটেই না"—

"এখানে আসবার ঠিক আগে, কিম্বা তারও আগে মদ খান নি আপনি ?"

"আপনাকে বড্ড অসুস্থ দেখাচ্ছে পুরন্দরবাবু। আপনার জ্বর হয় নি তো—"

"না কিছু হয় নি। কাল দেখা করব আপনার সঙ্গে একটা নাগাদ"—

"এসে পর্য্যন্ত আমি লক্ষ্য করছি আপনি কেমন যেন প্রকৃতিস্থ নন"—উপভোগ করতে করতে কথাগুলো বললে যুগল পালিত—"সত্যি বড় খারাপ লাগছে আমার, বিবেক দংশন করছে। এরকম সময়ে এসে আপনাকে… আমি যাচ্ছি…শুয়ে পড়ুন আপনি, ঘুমুন একটু—"

"শুনুন, আপনার ঠিকানাটা কি"

"৭২, বহুবাজার ষ্ট্রীট—

"ও আচ্ছা। যাব আমি—"

"নিশ্চয়। কৃতার্থ হব তাহলে—"

যুগল পালিত সিঁড়ি দিয়ে নামছিল।

"শুনুন"—পুরন্দরবাবু ডাকলেন আবার—"ঠিকানা বদলে ফেলবেন না তো···"

"ঠিকানা বদলে ফেলব মানে? কি যে বলেন!"

বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়েই ঘাড় ফিরিয়ে হাসি গোপন করলে যুগল পালিত।

কোন উত্তর না দিয়ে দড়াম করে' কপাটটা বন্ধ করে' দিলেন পুরন্দরবাবু। খিল দিলেন। তালা লাগালেন। জানালার কাছে গিয়ে থু থু করে' অনেকবার থুতু ফেললেন, মুখের ভিতর কেমন অস্বস্তি অনুভব করছিলেন যেন একটা। নিস্পন্দ হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন মিনিট পাঁচেক। তারপর হঠাৎ গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন আবার

৪

প্রগাঢ় নিদ্রার পর বেলা সাড়ে ন'টার সময় উঠলেন তিনি। মুহূর্ত্তেই সব মনে পড়ে গেল। বিছানায় উঠে বসলেন। অপর্ণার মৃত্যুর কথাই মনে হতে লাগল। কাল রাত্রে আকস্মিক মৃত্যুসংবাদটা সমস্ত ওলটপালট করে দিয়েছে, অতিশয় বেদনাময় অনুভূতি রেখে গেছে একটা সারা বুক জুড়ে। যুগল পালিত যতক্ষণ ছিল বেদনাটা ঢাকা ছিল। এখন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। শুধু তাই নয়, ন'বছর আগে যা যা ঘটেছিল মানস-পটে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে সব।

এই মহিলাটিকে, যুগল পালিতের স্ত্রী এই অপর্ণা পালিতকে, তিনি একদিন ভালবেসেছিলেন। যতদিন বর্দ্ধমানে ছিলেন ততদিন তার প্রণয়ী ছিলেন তিনি। বর্দ্ধমানে তিনি গিয়েছিলেন নিজের কাজে—সে-ও এক মকোর্দ্দমার ব্যাপার। কিন্তু সেজন্য পুরো এক বছর বাড়ি ভাড়া করে' সেখানে না থাকলেও চলত। প্রণয়-ব্যাপারের জন্যেই অতদিন থেকে গিয়েছিলেন। সত্যিই বড্ড জড়িয়ে পড়েছিলেন। অপর্ণা তাঁকে যেন যাদু করেছিল। যেন ভর করেছিল তাঁর উপর। এই মেয়েটার সামান্য খেয়াল মেটাবার জন্যে না করতে পারতেন হেন কাজ ছিল না।

বস্তুত তার পূর্ব্বে এ রকম অভিজ্ঞতা কখনও হয় নি তাঁর। তীব্র উন্মাদনার আস্বাদ সেই তাঁর জীবনে প্রথম। এক বৎসর পরে বিচ্ছেদ যখন আসন্ন হয়ে এল, (যদিও সে বিচ্ছেদ দীর্ঘ হবে না এই আশা তিনি তখন করেছিলেন)—সত্যিই যাবার সময় ঘনিয়ে এল যখন, তখন এমন অধীর হয়ে পড়েছিলেন যে অপর্ণাকে হরণ করবার কথাও মনে হয়েছিল তাঁর। তাকে সে কথা বলেও

ছিলেন—স্বামীকে ছেড়ে, ঘর সংসার ছেড়ে, সমাজকে তুচ্ছ করে' তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যাবার কথাও পেড়েছিলেন—হ্যাঁ, সনির্বন্ধ অনুরোধই করেছিলেন—বেশ মনে পড়ছে। যদিও অপর্ণা প্রথমটা নিমরাজি হয়েছিল (হয় তো সংসারের একঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে, হয় তো অভিনবত্বের আশায়) কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে বেঁকে দাঁড়াল। সে আপত্তি করল বলেই পুরন্দরবাবুকে একা বর্দ্ধমান ত্যাগ করতে হল। তা না হলে পুরন্দরবাবু তাকে নিয়েই আসতেন। কেউ তাঁর গতিরোধ করতে পারত না। অপর্ণাই তাঁকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করেছিল।

কোলকাতায় ফিরেই কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই তাঁর মনে হত, বারবার মনে হত—সত্যিই কি অপর্ণাকে ভালবেসেছিলেন তিনি? এ প্রশ্নের কিন্তু কোন সদুত্তর মিলত না। ভালবাসা? না, মোহ? ঠিক করতে পারেন নি কিছু। আজও পারেন নি। কোলকাতায় ফিরে নতুন কোন প্রেমের প্রভাবে পড়ে' যে একথা মনে হত তা নয়। যদিও ফিরে এসেই তিনি দলে মিশে বাগবাজার সোনাগাছি চষে' বেড়িয়েছিলেন রীতিমত —কিন্তু সেই প্রথম দু'মাস তাঁর সমস্ত মন কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়েছিল। কোন মেয়েমানুষই চোখে লাগে নি, কেউ মনে দাগ কাটতে পারে নি। অপর্ণার প্রতি তাঁর মনোভাব ভালবাসা না মোহ, এ প্রশ্ন মনে বারম্বার জাগলেও এটা তিনি ঠিক জানতেন যে, আবার কোনক্রমে যদি বর্দ্ধমানে গিয়ে পড়েন তাহলে অপর্ণারই গায়েপাশে আবার গিয়ে ধরা দেবেন অসঙ্কোচে, কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। পাঁচ বৎসর পরেও তাঁর এ বিশ্বাস বদলায় নি পাঁচ বৎসর পরে একথা স্বীকার করতে কিন্তু লজ্জা হত তাঁর—সমস্ত অন্তর আত্ম-ধিক্কারে ভরে উঠত, অপর্ণার উপরও ঘৃণা হত, সত্যটা কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারতেন না। বর্দ্ধমানের ব্যাপারটা ভেবে মাঝে মাঝে আশ্চর্য্যও লাগত খুব। তিনি—পুরন্দর রায়চৌধুরী—কি করে' এমন একটা খপ্পরে পড়লেন! প্রেম? অসম্ভব। লজ্জায় দুঃখে আত্মগ্লানিতে চোখে জলও

এসে পড়েছে। হ্যাঁ জল! আরও কিছুদিন পরে অনেকটা শান্ত হয়েছিলেন অবশ্য। প্রাণপণে ভুলতে চেষ্টা করেছিলেন, মন থেকে নিশ্চিহ্ন করে' মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন ব্যাপারটাকে—সফলকামও যে হন নি, তা নয়। কিন্তু আজ হঠাৎ ন'বছর পরে অপর্ণার মৃত্যুসংবাদ শুনে সমস্ত মনে পড়ে যাচ্ছে আবার। সমস্ত।

একটা বিষয়ে বিস্ময় লাগছে কিন্তু। এখন, বিছানায় বসে বসে' নানাবিধ এলোমেলো চিন্তার মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট অনুভব করছেন তিনি—যদিও সংবাদটা পেয়ে চমকে উঠেছিলেন প্রথমটা, কিন্তু অপর্ণার মৃত্যু সত্যি তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে নি। সত্যি কোন দুঃখ হচ্ছে না। সত্যিই এতটা হৃদয়হীন আমি নাকি?—নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন। এখন অবশ্য আর ঘৃণা করেন না তাকে, পক্ষপাতশূন্য হয়ে তার প্রতি সুবিচার করবার ক্ষমতা হয়েছে এখন। ন'বছরের এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের মধ্যে অপর্ণার একটা স্বরূপ খাড়া করে-ছিলেন তিনি মনে মনে। মফঃস্বলের শহরে হাবভাবময়ী কলাকুশলা একধরণের ভদ্রমহিলা দেখা যায়—যারা সকলের সঙ্গে হেসে আলাপ করে, পার্টিতে যায়, সব কথায় বুকনি দেয়, অপর্ণাও সেই জাতের মেয়ে—তার বেশী কিছু নয়—তিনি হয় তো তাকে স্বপ্নলোকে দেবী বানিয়েছিলেন। হয় তো! এটাও মনে হত হয় তো তাঁর বিচার নির্ভুল নয়। বিশেষ করে' এই কথাটাই মনে হচ্ছে এখন। হয় তো···কিন্তু না—বিরুদ্ধ সাক্ষী অনেক বর্তমান। এই পূর্ণ গাঙুলী লোকটা পাঁচ বছর সংশ্লিষ্ট ছিল এই পরিবারের সঙ্গে এবং তাঁর মতো সে-ও হয়তো ফেঁসে ছিল। পূর্ণ গাঙুলী কোলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলে, কোলকাতায় থাকলে তার হিল্লে হ'ত কিছু একটা, কারণ তার মস্তিষ্কে বা চরিত্রে এমন কিছুই ছিল না (পুরন্দরবাবুর তাই ধারণা অন্তত) যার জোরে চেনা-শোনা সমাজের বাইরে গিয়ে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু কোলকাতা ত্যাগ করে' অর্থাৎ তার ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিয়ে সে বর্দ্ধমানে গিয়ে আড্ডা গাড়লে—কেবল ওই অপর্ণার জন্যে। শেষ

পর্য্যন্ত কোলকাতায় এল—অপর্ণা তাকে ছেঁড়া জুতোর মতো পরিত্যাগ করেছিল বলে' সম্ভবত। ওই মেয়েটার সত্যিই আকর্ষণ করবার, বশ করবার, শাসন করবার অদ্ভুত কুহকিনী শক্তি ছিল একটা।

কিন্তু যে সব গুণের জোরে মেয়েরা পুরুষদের সাধারণত আকর্ষণ করে, বশ করে, অপর্ণার সে সব গুণ ছিল না। সুন্দরী ছিল না মোটেই। অত্যন্ত সাদামাটা চেহারা। পুরন্দরবাবুর সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন তার বয়সও আটাশ বছর—অর্থাৎ যৌবনও উত্তীর্ণ প্রায়। সুন্দরী না হলেও তার সারা মুখে অপূর্ব্ব কমনীয়তা ছিল একটা, চোখ খুব বড় ছিল না, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে ছিল অদ্ভুত শক্তির ব্যঞ্জনা। রোগা ছিল খুব। খুব বেশী লেখাপড়া শেখে নি, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। কেমন যেন জেদি গোছের ছিল। নিজের মতকেই চূড়ান্ত বলে জানত। মতান্তর শোনবার ধৈর্য্য ছিল না। কখনও কোন ব্যাপারে আপোষ করে নি। চালচলনে শহুরে ভাব খুব বেশী না থাকলেও বেশ একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। নিপুণ বৈশিষ্ট্য। মার্জ্জিত রুচিও ছিল, যদিও তার পরিচয় প্রধানত পাওয়া যেত প্রসাধনে আর সাজসজ্জায়। চরিত্রে ছিল সে সম্রাজ্ঞী—আধিপত্য করবার লোভ এবং শক্তি দুইই ছিল তার। যাকে ভালবাসত তাকে পদানত করে' রাখত একেবারে। আসন্ন বিপদে দিশাহারা হয়ে পড়ত না কখনও। বিপদের সময় তার মনের জোর দেখে অবাক লাগত সত্যি। অদ্ভুত চরিত্র। উদারতা এবং নীচতার এমন সমন্বয় কদাচিৎ চোখে পড়ে। তার সঙ্গে তর্ক করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল একরকম। যুক্তির ধার ধারত না, প্রয়োজন হলে 'দু' দুগুণে চার' এ সত্যকেও ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে বাধত না তার। নিজের দোষ বা নিজের ভুল দেখতেই পেত না কখনও। স্বামীকে আজীবন বঞ্চনা করে এসেছে, অসংখ্য চাতুরী খেলেছে তার সঙ্গে—কিন্তু সে জন্য কখনও দুঃখিত বা অনুতপ্ত হয় নি। তাকে দেখে পুরন্দরবাবুর মনে পড়ত উর্ব্বশী কবিতার প্রথম লাইনটা—নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ

সুন্দরী রূপসী। ও যেন সকলের। চিরন্তনী কামিনী! নিজেও বোধ হয় সে তাই অকপটে বিশ্বাস করত। পুরুষের মনোহরণ করাই তো তার কাজ। তাতে আর পাপ পুণ্য কি! যাকে যতক্ষণ ভালবাসত ততক্ষণ তার সঙ্গে প্রতারণা করত না। কিন্তু ভালবাসা নিঃশেষ হয়ে যেই সুরু হত অভ্যাসের দাসত্ব, অমনি শিকল কাটার সুযোগ খুঁজে বেড়াত সে। প্রণয়ীকে পীড়নও যেমন করত, সোহাগও করত তেমনি। উদগ্র কামনার নিষ্ঠুর প্রতিমূর্ত্তি ছিল যেন। অথচ নীতি নিয়ে লম্বা বক্তৃতা—হ্যাঁ, বক্তৃতাই দিত—ভ্রষ্ট চরিত্র লোককে নিদারুণ ভাষায় গালাগালি দিতে শতমুখ হ'য়ে উঠত. অথচ নিজে ছিল ভ্রষ্টা! কিন্তু সে যে ভ্রষ্টা তা কিছুতেই, হাজার প্রমাণ প্রয়োগ করেও, বোঝান যেত না তাকে। প্রণয়ী পুরন্দরবাবু মাঝে মাঝে ভাবতেন—"ভণ্ডামি নয়, সত্যিই হয়তো ও ওইরকম। হয়তো ভ্রষ্টা হয়েই জন্মেছে—ওই ওর প্রকৃতি। এ জাতীয় মেয়েরা কখনও বুড়ো হয় না, কখনও কারও গৃহিণী হয় না, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত একটার পর আর একটাকে বরণ করে যায় কেবল। ওই ওদের ধর্ম্ম। বিবাহিত স্বামীই বোধহয় ওদের প্রথম প্রণয়ী। কিন্তু সে প্রণয়টা আরম্ভ হয় বিবাহের পরে। এরা খুব সহজে স্বামী পাকড়াতেও পারে। যখন দ্বিতীয় প্রণয়ী বরণ করে তখন স্বামীকেই দোষ দেয়, যেন স্বামীর কাছে সুখের আস্বাদ না পেয়ে বাধ্য হয়ে পর-পুরুষের বাহুপাশে ধরা দিয়েছে। পর-পুরুষের বাহুপাশে যখন ধরা দেয় তখন প্রাণ ঢেলেই দেয়, তাতে কোন ভণ্ডামি থাকে না। শেষ পর্য্যন্ত ওরা মনে করে—যা করছি ঠিকই করছি, দোষের কিছু নেই এতে···। আমরা সতীই—"

এ ধরণের মেয়ে থাকা সম্ভব পুরন্দরবাবুর এ বিশ্বাস সত্যিই হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও তাঁর হয়েছিল যে, এই মেয়েদের অনুরূপ এক জাতীয় স্বামীও আছেন যাঁরা ঠিক এদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেন। অর্থাৎ যাঁরা চিরকাল স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করে যান্ আর কিছু করেন

না, আর কিছু করবার ক্ষমতাই নেই। এঁরা কেবল বিয়ে করবার জন্যই জন্মান যেন। নিজেদের চরিত্রের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও এঁরা বিয়ের পর অবিলম্বে স্ত্রীর পরিপূরক হয়ে পড়েন ঠিক। এঁদের কতকগুলো চারিত্রিক লক্ষণও থাকে। কেমন যেন মেয়েলি ভাবাপন্ন হন এঁরা। এঁদের চলন বলন হাবভাব সব কিছুই পেলব পেলব। দেখলেই চিনতে পারা যায়। পুরন্দরবাবুর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যুগল পালিত এই জাতীয় লোক। কিন্তু গতরাত্রে যে যুগল পালিতকে দেখা গেল সে তো একেবারে অন্য লোক, বর্দ্ধমানে যার সঙ্গে আলাপ ছিল এ তো সে নয়। অবিশ্বাস্য রকম বদলে গেল লোকটা। বদলাবারে কথাও—পুরন্দরবাবুর মনে হল—এ অবস্থায় বদলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। স্ত্রীর জীবিতকালে সে স্ত্রীর পরিপূরক ছিল, স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে আর তা থাকবে কি করে'—সে তো এখন একটা ভগ্নাংশ মাত্র…দু'জনে মিলে সমগ্র ছিল। সমগ্র জীবনের একটা অংশ হঠাৎ কেটে বেরিয়ে এসেছে যেন…বিস্ময়কর এবং অদ্ভুত।

অতীতের যুগল পালিত সম্বন্ধে পুরন্দরবাবুর মনে নানা কথা জাগছিল। অনেক ঘটনা, অনেক স্মৃতি…

"বর্দ্ধমানে লোকটা স্বামী ছাড়া আর কিছু ছিল না। চাকরি করত, একজন পদস্থ কর্ম্মচারীই ছিল, কিন্তু তাও যেন স্ত্রীর জন্যই! স্ত্রীর গয়না কাপড় কেনবার জন্য, তার সামাজিক সম্ভ্রম বাড়াবার জন্য দশটা পাঁচটা আপিস করে মরত লোকটা। আর খুব নিষ্ঠাভরেই করত। একটু ফাঁকি দিত না কাজে। অথচ আপিসে খুব যে একটা সুনাম ছিল তাও নয়। দুর্নামও ছিল না। বাপের বিষয় আশয় ছিল কিছু। ভালভাবেই চলে যেত। দামী শোফা সেটি, কার্পেট, দামী দামী বাসন পেয়ারা বয়।—চতুর্দ্দিক ঝকঝকে, তকতকে টিপটপ রাখতেই হত। কারণ ভয়ানক বড়লোক ঘেঁসা ছিল। বড় বড় অফিসার তো বটেই, নামজাদা যে কোন লোকের সঙ্গেই আলাপ করতে পেলে বর্ত্তে যেত যেন

লোকটা। বাড়িতে সবাইকে নিমন্ত্রণ করত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিত। বহু বড়লোকের সঙ্গে বেশ দহরম মহরম ছিল। অপর্ণারও বেশ খাতির ছিল বড়লোক মহলে। অপর্ণা অবশ্য খাতির পেয়ে গলে' পড়ত না কখনও। নিজের ন্যায্য প্রাপ্য হিসেবেই নিত সে এসব। কিন্তু নিজের বাড়ীতে বড় বড় লোকদের সে নিমন্ত্রণ করত যখন, তখন সত্যিই উপভোগ্য হত ব্যাপারটা। অতিথি-সৎকার করতে জানত সে। যুগলকেও এমন তালিম দিয়ে ছিল যে নামজাদা অভিজাতবংশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করতেও তার তাল কাটত না কখনও। পুরন্দরবাবুর মাঝে মাঝে সন্দেহ হত যে যুগল পালিতেরও নিজস্ব বুদ্ধি আছে কিছু—ইচ্ছে করলে নিজের শক্তিতেই হয়তো আলাপ করতে পারে সে—কিন্তু পাছে বেশী বকবক করে এই ভয়ে অপর্ণা তাকে ওজনকরা ভদ্রতা-সম্মত কথা ছাড়া অন্য কথা কইতেই দিত না। ভদ্রসমাজে যুগল পালিতের স্বকীয়তা পরিস্ফুটই হতে পায় নি কখনও। ভাল-মন্দ মিশিয়ে তার নিজস্ব চরিত্র ছিল নিশ্চয়ই একটা। কিন্তু তা কেউ জানবার সুযোগ পায় নি। মৃদু হেসে আলতো আলতো ভদ্রতা করেই কালক্ষেপ করতে হত তাকে। তার সদগুণগুলো চাপা পড়ে যেত অপর্ণার জ্যোতিতে, আর বদগুণগুলো বিলুপ্ত হত তার শাসনে। পুরন্দরবাবুর মনে পড়ল যুগল পালিতের পরচর্চা করার দিকে একটু ঝোঁক ছিল, প্রতিবেশীদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে ভালই বাসত সে—কিন্তু অপর্ণার ভয়ে সে মুখ খুলতে পারত না। নানারকম গালগল্প করার দক্ষতা ছিল যুগলের, কিন্তু করতে পেত না। যা সংক্ষেপে সারা যায় এবং যা কোন দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য নয় এ রকম প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপনই করতে দিত না তাকে অপর্ণা। যুগল মদ খেত, সুযোগ পেলে বেশ টানতে পারত, কিন্তু উপায় ছিল না। অপর্ণা ভারী কড়া ছিল সে বিষয়ে। স্ত্রীর ভয়ে যুগল মদ ছুঁত না। কিন্তু বাইরে থেকে তাকে স্ত্রৈণ বলে' সন্দেহ করবার উপায় ছিল না—বরং মনে হত অপর্ণাই পতিভক্তিপরায়ণা বাধ্য স্ত্রী, ভুলেও স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করে

না। শুধু মনে হত নয়, অপর্ণা তা নিজেও বিশ্বাস করত সম্ভবত। যুগল হয় তো অপর্ণাকে ভালবাসত—হয় তো খুব গভীরভাবেই ভালবাসত, কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় ছিল না। অপর্ণার কড়া শাসনের জন্যই হয় তো ছিল না। বর্দ্ধমানে থাকবার সময় পুরন্দরবাবুর প্রায়ই মনে হ'ত তাঁর সঙ্গে অপর্ণার যে সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে তা যুগল জানে কি না। কোন সন্দেহই কি হয় না তার মনে? অপর্ণাকে প্রশ্নও করেছেন অনেকবার—কিন্তু প্রতিবারই এক উত্তর পেয়েছেন। অপর্ণা বিরক্তি ভরে প্রতিবারই বলেছে—উনি কিছু জানেন না, জানতে পারেন না—ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। অপর্ণার আর একটা বিশেষত্ব ছিল—স্বামীকে কখনও খেলো করবার চেষ্টা করত না সে। অপর কেউ করলে বরং চটে যেত, স্বামীর পক্ষ নিয়ে কোমর বেঁধে তর্ক করত তার সঙ্গে। ছেলেপিলে ছিল না, সুতরাং একটু বার ফটকা হতেই হয়েছিল তাকে। কোন নিমন্ত্রণ, কোন পার্টি বাদ যেত না। কিন্তু তাই বলে' যে ঘরের দিকে টান ছিল না, তা নয়। মনে হত বাইরের সামাজিক আনন্দে তার মন ভরত না। ঘর-সাজানো, শেলাই-করা, রান্নার ব্যবস্থা করা এই সব গৃহস্থালী কাজেও অনেক সময় কাটাত সে। কাল রাত্রে যুগল যে কথাটা বললে—অনেক সময় সন্ধ্যাবেলায় পড়াশোনার চর্চ্চাও হত। কখনও যুগল পালিত কোন বই পড়ত তাঁরা শুনতেন। তিনিও পড়তেন কখনও কখনও। যুগল চমৎকার পড়তে পারত, মাঝে মাঝে তাক লেগে যেত পুরন্দরবাবুর। অপর্ণা সেলাই করতে করতে গম্ভীরভাবে শুনত। রবিবাবুর গল্প কবিতা পড়া হত বেশী - কিন্তু মাঝে মাঝে গম্ভীর জিনিসও হত—হীরেন দত্তর 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' পড়া হয়েছিল একদিন। পুরন্দরবাবুর রুচি ও বিদ্যার প্রতি অপর্ণার শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু নীরবে শ্রদ্ধা করত সে। কখনও উচ্ছ্বসিত হয় নি। ভাবটা যেন পুরন্দরবাবুর শ্রেষ্ঠত্ব এমনই অবিসংবাদিত যে তা' নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক বিষয়ে সে প্রায় চুপ করেই থাকত—পুরন্দরবাবুর

মনে হত এ সব বিষয়ে খুব যেন উৎসাহ নেই তার। সমাজে থাকতে গেলে এ সবের সংশ্রবে বাধ্য হয়ে আসতে হয়—হয় তো এদের উপযোগিতাও আছে কিছু—তাই যেন সে এসব সহ্য করে। যুগলের কিন্তু খুব উৎসাহ ছিল এ সব বিষয়ে।

পুরন্দরবাবুর দিক থেকে ব্যাপারটা যখন চরমে উঠেছিল—অর্থাৎ যখন তিনি প্রায় উন্মত্ততার শেষ সীমায় উপস্থিত হব হব করছিলেন—ঠিক সেই সময়ে প্রণয় পর্বে ছেদ পড়ল হঠাৎ একদিন। হঠাৎ অপর্ণাই সব চুকিয়ে দিল একদিন! তাকে ছেঁড়া চটির পাটির মতো ছুঁড়ে ফেলে দিলে যে—এ কথা কিন্তু বুঝতে পারেন নি তিনি তখন।

এর মাস দুই আগে এক বিলেত-ফেরত ছোকরা পুলিশ বিভাগে বড় চাকরি নিয়ে বর্দ্ধমানে এসেছিল। যুগলদের বাড়িতে যাতায়াতও সুরু করেছিল সে। আগে তাঁরা তিন জন ছিলেন—ইনি আসাতে চার জন হলেন। অপর্ণা এই 'ছেলেমানুষ' অফিসারটিকে বেশ সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করলে—ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল তাকে 'ছেলেমানুষ' বলেই গণ্য করেছে সে। পুরন্দরবাবুর মনে তাই কোন সন্দেহই হয় নি। এ সব কথা ভাববার মতো মনের অবস্থাও ছিল না তাঁর—কারণ অপর্ণা তখন তাঁকে 'নোটিশ' দিয়েছে। বিচ্ছেদ অনিবার্য। বহু কারণ অপর্ণা দেখিয়েছিল—তার মধ্যে প্রধানতম—সে সন্তানসম্ভবা। সুতরাং অবিলম্বে অন্তত চার পাঁচ মাসের জন্য স্থান ত্যাগ করতে হবে···এ নিয়ে কোন কেলেঙ্কারী যদি হয় তাহলে তার স্বামীর মনে কোন সন্দেহ জাগবে না অন্তত। পুরন্দরবাবুর মনে হল যুক্তিটা বড্ড বেশী প্যাঁচালো। তিনি সোজা বললেন—চল আমার সঙ্গে। বম্বে, মাদ্রাজ, কাশী, কাশ্মীর যেখানে হোক। কিন্তু কিছু হল না, তাঁকে একাই ফিরতে হল শেষ পর্যন্ত। অবশ্য মাত্র তিন চার মাসের জন্য—এ আশ্বাস না পেলে কোন ব্যক্তিই নিরস্ত করতে পারত না তাঁকে, অপর্ণাকে নিয়েই আসতেন তিনি। ঠিক দু'মাস পরে অপর্ণার এক চিঠি পেলেন—আপনার

ফেরবার দরকার নেই আর। যা মরে' গেছে, কি হবে তাকে আবার বাঁচিয়ে? চেষ্টা করলেও তা কি আর বাঁচে কখনও? সুখবর আছে একটা, আমার যে 'ভয়' হয়েছিল তা অলীক। পুরন্দরবাবু খবর পেলেন "ছেলেমোহন" পুলিশ অফিসারটি বেশ জমিয়েছেন সেখানে। পুরন্দরবাবুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল তখন। মোহের সমস্ত কুয়াসা কেটে গেল নিমেষে। আরও কিছুদিন পরে, মানে কয়েক বৎসর পরে, এ খবরও তিনি পেয়েছিলেন যে পূর্ণ গাঙ্গুলীও গিয়ে জুটেছিল সেখানে এবং এক আধ দিন নয় পুরো পাঁচটি বচ্ছর ছিল। পূর্ণ গাঙ্গুলীর এত দুর্দৈব সৌভাগ্যের কারণ বোধ হয় অপর্ণা বুড়ো হয়ে আসছিল ক্রমশ, ছেড়ে বেড়াবার প্রকৃতি ছিল না, সুযোগও জোটে নি হয় তো।

বিছানায় পুরো এক ঘণ্টা বসে' রইলেন তিনি। তারপর উঠে স্নান করলেন, চা খেলেন। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লেন তাড়াতাড়ি, যুগল পালিতের খোঁজে। তার সঙ্গে কাল রাত্রে যে অভদ্র ব্যবহারটা করেছিলেন তার স্মৃতিটা মুছে ফেলতে হবে যেমন করে হোক। ছি, ছি, বড় দুর্ব্যবহার করে ফেলেছেন···।

গত রাত্রে যুগল পালিতের রহস্যময় আবির্ভাবটার নানা ব্যাখ্যা নিজেই বার করছিলেন তিনি মনে মনে···হয়তো আকস্মিক খেয়াল লোকটার··· কিম্বা হয় তো মদ খেয়েছিল···কিম্বা আরও কিছু হবে হয় তো। কিন্তু যার সঙ্গে সব চুকে বুকে গেছে তার স্বামীর সঙ্গে আবার কেন যে তিনি নূতন করে' পরিচয় ঝালাতে যাচ্ছেন তার কোন ব্যাখ্যা তার মাথায় এল না। কি যেন একটা আকর্ষণ করছিল তাঁকে। প্রাণে একটা অদ্ভুত সাড়া তুলেছে লোকটা।

৫

যুগল পালিত ঠিকানা বদলায় নি। সে রকম কোন উদ্দেশ্যই তার ছিল না। পুরন্দরবাবু কেন যে ওরকম বেখাপ্পা একটা প্রশ্ন করেছিলেন তা তিনি নিজেই ঠিক করতে পারছিলেন না। একটু খোঁজ করেই যুগলের বাসাটা পেয়ে গেলেন তিনি। দোতলায় থাকে যুগল। সঙ্কীর্ণ অন্ধকার নোংরা স্যাঁতসেতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠেই একটা কান্না শুনতে পেলেন। ছোট মেয়ের কান্না, মিহি গলা ··সাত আট বছরের মেয়ের মত মনে হল...ধক্ করে উঠল বুকটা। গুমরে গুমরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটা...আর কে যেন ধমকাচ্ছে তাকে . মেঝেতে পা ঠুকে ঠুকে চীৎকার করছে...ভাঙা কর্কশ গলা ..চেষ্টা করছে মেয়েটার কান্না বাইরের কেউ যেন শুনতে না পায়, ধমক দিয়ে চুপ করতে বলছে তাকে এবং এই সব করতে গিয়ে নিজেই বেশী চেঁচাচ্ছে। নির্ম্মম কণ্ঠে চেঁচাচ্ছে লোকটা...মেয়েটা ক্ষমা ভিক্ষা করছে...আর কোরব না, আর কোরব না ..মাপ কর আমাকে··· উঠেই লম্বা গোছের একটা লোকের সঙ্গে দেখা হল। গলায় পৈতে, ঘাড়ে গামছা···রাঁধুনী বোধ নয়। যুগল পালিতের কথা জিগ্যেস করতেই যে ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছিল সেই ঘরটা দেখিয়ে দিলে সে। পুরন্দরবাবু লক্ষ্য করলেন তার চোখের দৃষ্টি থেকে ঘৃণা ফুটে বেরুচ্ছে।

"কি কাণ্ড" বলে সে নেমে গেল।

পুরন্দরবাবু কড়া নাড়তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কি ভেবে কড়া না নেড়ে সোজা ঢুকে গেলেন ভিতরে। যুগল পালিত খালি গায়ে ঘরের মাঝখানে

দাড়িয়ে—চীৎকার করে' ধমকে' (এবং খুব সম্ভব মার-ধোর করে) একটা সাত-আট বছরের মেয়ের কান্না থামাবার চেষ্টা করছে। মেয়েটার গায়ে একটা ময়লা ছেঁড়া ফ্রক। ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল সে। যুগল পালিতের দিকে দু' হাত বাড়িয়ে সে যেন তাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছিল; একটা কাতর অনুনয় যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল তার সর্ব্বাঙ্গে। মুহূর্ত্তে সমস্ত দৃশ্য বদলে গেল। একজন আগন্তুককে দেখে মেয়েটা পাশের একটা ছোট ঘরে পালিয়ে গেল ছুটে। যুগল হতভম্ব হয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর তার মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল একটা। কাল রাত্রে পুরন্দরবাবু সিঁড়ির কপাট খুলে তার মুখে যেমন হাসি দেখতে পেয়েছিলেন ঠিক তেমনি।

"পুরন্দরবাবু!" সবিস্ময়ে বলে উঠল সে—"সত্যিই আমি আশা করি নি—আসুন আসুন—এই চেয়ারটায় বসুন···ইজি-চেয়ারটায় বসবেন? আমি ততক্ষণ..."

তাড়াতাড়ি সে ওপন-ব্রেষ্ট কোটটা গায়ে দিয়ে ফেললে।

"ব্যস্ত হবেন না।"

পুরন্দরবাবু চেয়ারটায় বসলেন।

"না, জামাটা গায়ে দিয়ে নি, মানে—ওকি আপনি কোণে বসলেন কেন, এই ইজি-চেয়ারটায় বসুন না। সত্যি আপনি যে আসবেন তা ভাবতে পারি নি···সত্যিই প্রত্যাশা করিনি।"

একটা চেয়ার একটু সরিয়ে নিয়ে তার হাতলটার উপর বসল সে।

"আমাকে প্রত্যাশা করেন নি কেন! আমি তো বলেছিলাম আসব সকালে।"

"আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আসবেন না আপনি। কাল রাত্রে যা হয়ে গেল তারপর আপনার আসাটা সম্ভবপর মনে হয় নি। মনে হচ্ছিল জীবনে বোধ হয় আপনার সঙ্গে দেখা হবে না আর।"

পুরন্দরবাবু চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। সবই কেমন যেন

এলোমেলো। বিছানা করা হয় নি, কাপড়-চোপড় চারদিকে ছড়ানো, টেবিলে এঁটো চায়ের পেয়ালা, রুটির টুকরো পড়ে রয়েছে আশে-পাশে, আধ বোতল মদও রয়েছে, বোতলে ছিপি নেই, পাশেই একটা গ্লাস। পাশের ঘরের দরজাটার দিকে চাইলেন একবার, কোন সাড়াশব্দ নেই। মেয়েটা চুপ করে আছে।

"মদ খাচ্ছিলেন না কি" বোতলটা দেখিয়ে পুরন্দরবাবু বললেন।

"না ও কালকের পড়ে আছে খানিকটা, মানে—" যুগল অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল একটু।

"খুব পরিবর্তন হয়েছে আপনার।"

"হ্যাঁ, এ সব ছিল না আগে আমার। কিন্তু গত ফাল্গুন মাসের পর থেকে ধরেছি। সাইরি বলছি। কিছুতে সামলাতে পারি না। তবে এখন আমি খাই নি, মানে মাতাল নই, ভয় পাবেন না। কাল রাত্রে যা করেছিলাম তা আর করব না···কাল রাত্রে ছি ছি কেলেঙ্কারি—কিন্তু সত্যি বলছি গত ফাল্গুন থেকে ..আমার যে এ দশা হবে, এমনভাবে যে ভেঙে পড়ব আমি, তা কে জানত। ছ'মাস আগে কেউ যদি বলত আমায়—বিশ্বাসই করতাম না, কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না—"।

"কাল রাত্রে মাতাল অবস্থায় আমার কাছে গিয়েছিলেন তাহলে—"

'হ্যাঁ"—মাটির দিকে চেয়ে একটু কুণ্ঠিত ভাবেই যুগল পালিত বললে কথাটা। "ঠিক সেই সময়ে মদ না খেলেও, তার খানিকক্ষণ আগে খেয়েছিলাম। মদ খাবার খানিকক্ষণ পরে আমার অবস্থা আরও খারাপ হয়। একটু পেটে পড়লেই কেমন যেন হয়ে যাই। কেমন যেন মাথায় খুন চড়ে যায়, মুখ ছুটতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় দুঃখে বুকটা ফেটে যাবে বুঝি। দুঃখ ভোলবার জন্যেই মদ ধরেছিলাম হয়তো। কে জানে? মদ খেলে কিন্তু আমি না করতে পারি হেন কাজ নেই, যেখানে যাওয়া উচিত নয় সেখানে গিয়ে হাজির হই, যা মুখে আসে

বলি, অপমান করে বসি যাকে তাকে। কাল আমাকে খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল—না ?"

"আপনার মনে নেই ?"

"মনে নেই ! সব মনে আছে…"

"আমারও ঠিক ওই একই কথা মনে হচ্ছে—" পুরন্দর হেসে বললেন। "আমিও আপনার সঙ্গে ব্যবহারেটা ঠিক, মানে মেজাজটাই আমার কেমন যেন বিগড়ে ছিল কাল…কেমন যেন তিরিক্ষি গোছের…আমার হয় এরকম মাঝে মাঝে। তাছাড়া কাল অমনভাবে আপনার আসাটা…"

"হ্যাঁ, অত রাত্রে। ঠিক !"—যুগল মাথা নেড়ে সায় দিলে।

কাল রাত্রে কিসে যেন ভর করেছিল আমার উপর। আপনি যদি তখন ঠিক মুহূর্তে দরজা না খুলতেন তাহলে দরজা থেকেই আমি ফিরে যেতাম হয়তো। এক সপ্তাহ আগে আমি আর একদিন গিয়েছিলাম, আপনি বাড়ি ছিলেন না। আর হয়তো আমার যাওয়া উচিত ছিল না, কারণ—যাই বলুন, যদিও দুরবস্থা হয়েছে আমার—আত্মসম্মান এখনও বিসর্জন দিতে পারি নি একেবারে। রাস্তায় কতবার দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে, প্রতিবারই আমি ভেবেছি—বাঃ উনি চিনতেই পারছেন না আমাকে, মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছেন—ন' বছরের ব্যবধান তো ভীষণ দেখছি। প্রতি-বারই আসব আসব করে' আসতে পারি নি। কাল রাত্রে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম আপনার বাড়ির কাছে হঠাৎ…কত রাত হয়েছে খেয়ালই ছিল না। খেয়াল না থাকবার হেতু ওই (বোতলটা দেখাল)—আমার মানসিক অবস্থাও অবশ্য দায়ী খানিকটা। অন্যায় হয়েছিল খুবই। অপর কেউ হলে বোধ হয় মেরে বার করে' দিত আমাকে। আপনি বলে' তাই আবার এসেছেন আমার কাছে—"

পুরন্দরবাবু মন দিয়ে প্রতি কথাটি শুনছিলেন। যুগলের কথাগুলো আন্তরিক বলেই মনে হয়, কিন্তু তার একটি কথা বিশ্বাস করছিলেন না তিনি।

"আপনি কি একাই আছেন? ওই যে ছোট মেয়েটি দেখলাম ওটি কার?"

যুগল সবিস্ময়ে ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করে চেয়ে রইল ক্ষণকাল। তার পরই তার চোখের দৃষ্টিতে আনন্দ ঝলমল করে উঠল যেন।

"ওই ছোট মেয়েটি? ও পাপিয়া।"

"কে পাপিয়া?" প্রশ্নটা করেই পুরন্দরবাবুর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। সম্ভাব্য উত্তরটার সম্বন্ধে সহসা সচেতন হলেন যেন। প্রথম ঘরে ঢুকেই যখন তিনি পাপিয়াকে দেখেছিলেন তখন এ কথা মনে হয় নি।

"কে আবার, আমাদের পাপিয়া, আমাদের মেয়ে পাপিয়া"—যুগলের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

"আপনার মেয়ে? মানে, আপনার অপর্ণা দেবীর?......অপর্ণা দেবীর ছেলে-পিলে হয়েছিল নাকি! শুনিনি তো—"

একটু ইতস্তত করে' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন পুরন্দরবাবু।

"হয়েছিল বই কি! কিন্তু, ঠিক তো, আপনি শুনবেন কি করে? মাথা খারাপ হয়েছে আমার। আপনি চলে আসবার পরই পাপিয়ার জন্ম হয়—হ্যাঁ, ঠিক তার পরই মার কোল আলো করে ও এল···"

যুগল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল হঠাৎ···মনে হল যেন বসে থাকতে পারছে না।

"আমি কিছুই শুনি নি"—বিবর্ণমুখে উত্তর দিলেন পুরন্দরবাবু।

"ঠিক তো, ঠিক তো, কি করে' শুনবেন আপনি"—যুগলের কণ্ঠস্বর আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে আসছিল—"ছেলে হবার তো কোন আশাই ছিল না আমাদের, আপনি তো জানেন, মাদুলি কবচ কত কি ধারণ করেছিলাম আমরা—হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে সদয় হলেন ভগবান—হা হা হা। কি আনন্দ যে হয়েছিল তা অনুমান করা শক্ত নয়—আপনি চলে আসবার এক বৎসর—না, ভুল করছি—পুরো এক বছর হবে না—থামুন, আপনি যতদূর

মনে পড়ছে অক্টোবর মাসে বর্দ্ধমান থেকে চলে আসেন—অক্টোবর, না নভেম্বর ?"

"আমি বর্দ্ধমান থেকে এসেছিলাম সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে। তারিখটা মনে আছে আমার ১২ই সেপ্টেম্বর—"

"ও, সেপ্টেম্বর ? তাই না কি, ও···হ্যাঁ, কি বলছিলাম।" কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল যুগল পালিতের।

"ও হ্যাঁ—তাই যদি হয়—১২ই সেপ্টেম্বর, আর পাপিয়ার জন্ম হয়েছে ৮ই মে। তাহলে সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ্চ এপ্রিল মে—মানে আট মাসের কিছু ওপর। আপনি যদি দেখতেন ওকে পেয়ে অপর্ণার যে কি রকম—"

"ডাকুন ওকে, ডাকুন" বলতে গিয়ে পুরন্দরবাবুর গলাটা কেঁপে উঠল।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই"—যুগল পালিত ব্যস্ত হয়ে উঠল—"নিশ্চয়ই, এখনই ডাকছি ওকে। আপনার সঙ্গে ওর পরিচয় করা তো আগে দরকার—" দ্রুতপদে ছোট ঘরটার ভিতর সে-ও ঢুকে পড়ল।

পুরো পাঁচটি মিনিট কেটে গেল। ঘরের ভিতর থেকে নিম্নকণ্ঠে ফুসফুস কথাবার্ত্তা শোনা যেতে লাগল। মনে হল পাপিয়াও কি, বললে যেন। আসতে চাইছে না বোধ হয়, পুরন্দরবাবু ভাবলেন।

একটু পরেই বেরিয়ে এল দুজনে।

"এই দেখুন, আপনার নাম শুনে ভারী ঘাবড়ে গেছে, এত লাজুক! আত্মসম্মান বোধও কম নয় মেয়ের। হুবহু মায়ের প্রতিমূর্ত্তি আর কি—" যুগল হাত ধরে টেনে এনেছিল তাকে। সে আর কাঁদছিল না। মাটির দিকে চেয়ে ঘাড় হেঁট করে' চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। ছিপছিপে লম্বা গড়নের মেয়েটি, ভারী চমৎকার। চোখ তুলে চাইল একবার। কৌতূহল হল বোধ হয়। বড় বড় কালো চোখে কিন্তু বিষণ্ণ দৃষ্টি। একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল আবার। অপরিচিত লোক দেখলে শিশুদের চোখে যে

গম্ভীর দৃষ্টি ফুটে ওঠে, যে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তারা অপরিচিত আগন্তুককে আড়-চোখে নিরীক্ষণ করে. এর চোখেও তা আছে—কিন্তু তা ছাড়াও আরও কি যেন একটা আছে—পুরন্দরের মনে হল।

যুগল হাত ধরে তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে এল।

"তোমার কাকাবাবু হ'ন, তোমার মায়ের খুব বন্ধু ছিলেন এককালে। লজ্জা কি, প্রণাম কর।"

ভয়ে ভয়ে একটু নীচু হল সে—কিন্তু ঠিক প্রণাম করল না।

"ওর মা ওকে প্রণাম করতে শেখায় নি। সে কি বলত জানেন? সকলের পায়ে মাথা কুটে কুটেই এদেশের মেয়েরা আরও অপদার্থ হয়ে গেল। অদ্ভুত মত ছিল তার!"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে পুরন্দরবাবুর মুখের দিকে।

পুরন্দরবাবু বুঝতে পারছিলেন যে যুগল তাকে লক্ষ্য করছে, কিন্তু আত্মগোপন করবার কোন প্রয়াস আর করছিলেন না তিনি। পাপিয়ার হাত ধরে' তার মুখের দিকে চেয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু পাপিয়া একটু বিব্রত হচ্ছিল যেন—বাপের দিকে বারবার চাইছিল সে। যুগলের প্রতি কথাটি মন দিয়ে শুনছিল। পুরন্দর নির্ণিমেষে চেয়ে ছিল পাপিয়ার কালো চোখ দুটির দিকে। না, ও চোখ ভুল হবার নয়। মুখের লালিত্য, ঠোঁটের গড়ন, চুলের রং···অদ্ভুত মিল! যুগল ইতিমধ্যে অত্যন্ত আবেগভরে অনর্গল কি যে বকে যাচ্ছিল, পুরন্দরবাবু তা শুনতেই পাচ্ছিলেন না। শেষ কয়েকটা কথা শুধু তাঁর কানে গেল "··ভগবান যখন একে দিলেন তখন আমাদের কি যে আনন্দ হয়েছিল তা ধারণাই করতে পারবেন না আপনি। দেখতে দেখতে আমার নয়ন-মণি হয়ে উঠল মশাই। এমন কি এ-ও আমার মাঝে মাঝে মনে হত, অপর্ণাকে ভগবান যদি কেড়েও নেন পাপিয়াকে নিয়ে আমি সে শোক ভুলতে পারব। হ্যাঁ, এ বিশ্বাস আমার হয়েছিল—"

"আর মিসেস পালিতের?"

"অপর্ণার? তার স্বভাব তো আপনার ভাল করেই জানা আছে, সে মুখে বেশী কিছু প্রকাশ করতে পারত না, সে স্বভাবই ছিল না তার কিন্তু মৃত্যু-শয্যায় শেষ বিদায় নেবার বেলায় সব প্রকাশ হয়ে পড়ল শেষে। 'মৃত্যু-শয্যায় বলছি বটে কিন্তু মৃত্যুর কথা ভাবেও নি সে। মৃত্যুর আগের দিনও সে বলেছে যে আমরা মিছি মিছি ব্যস্ত হচ্ছি—তার কিছু হয় নি, ডাক্তাররা রোগ ধরতে পারছে না বাজে ওষুধ খাওয়াচ্ছে খালি। সারদাবাবু ফিরে এলেই (সারদা ডাক্তারকে মনে আছে আপনার?) ভাল হয়ে যাবে সে। কিন্তু দেখুন! মরবার পাঁচ ঘণ্টা আগেও বলেছে যে পাপিয়ার জন্মদিনে তার পিসিদের আনতে হবে···

পুরন্দরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন হঠাৎ। পাপিয়া তীক্ষ্ণ একাগ্র দৃষ্টিতে তার বাবার দিকে চেয়েছিল, পুরন্দরবাবুর মনে হ'ল দৃষ্টিতে যেন মৌন ভর্ৎসনাও ফুটে উঠেছে একটা।

"এর কোন অসুখ করে নি তো" তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করলেন তিনি, যদিও সেটা বেখাপ্পা শোনাল।

"এর? না, তা তো মনে হয় না···তবে এখানে যে অবস্থায় আছি, দেখতেই পাচ্ছেন"—যুগল পালিতের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ফুটে উঠল—"আর অদ্ভুত ওর স্বভাব, এমন ভীরু। মা মারা যাবার পর পনর দিন বড্ড কাবু হয়ে পড়েছিল, কেবল কান্না। এই এখুনি, আপনি আসবার ঠিক আগেই, কি কান্নাটাই কাঁদছিল। কেন কাঁদছিলি বল ত! শুনবেন? আমি ওকে একলা ফেলে রেখে বাইরে যাই কেন। বলছে মা বেঁচে থাকতে আমাকে তুমি যত ভালবাসতে এখন আর তত বাস না। এই নিয়ে অভিমান! কোথায় খেলনা নিয়ে খেলা টেলা করবে···অবশ্য খেলবার সঙ্গীও কেউ নেই এখানে—"

"একেবারে একা আছে ও?"

"একেবারে একা। চাকরটা দিনে একবার আসে শুধু—"

"আর ওকে একা রেখে বাইরে চলে যান আপনি?"

"কি করব? কাল যখন বেরুলাম ওকে ওই ছোট ঘরটায় পুরে তালা দিয়ে গেলাম। সেই জন্যেই আরও কাঁদছিল আজকে। কিন্তু ওছাড়া আর কি উপায় আছে বলুন। আপনিই বলুন, পরশু দিন রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিল, একটা ছোঁড়া এমন ঢিল ছুঁড়ে মেরেছে যে কপালটা কেটে গেছে। আমি বেরিয়ে গেলেই কাঁদবে, আর পাড়ার প্রত্যেককে জিগ্যেস করবে যে কখন ফিরব আমি। এটা কি ভাল? আপনিই বলুন। আমারও অবশ্য দোষ আছে, এখখুনি ফিরব বলে' বেরুলাম, এলাম তার পরদিন—কাল ঠিক এই হয়েছিল। আর সব চেয়ে চমৎকার হচ্ছে—ওর কান্নাকাটি শুনে—বাড়িওয়ালা কামার ডেকে তালা ভেঙে ঘর থেকে বার করেছিল ওকে—ছি—ছি—কি কাণ্ড···মনে হচ্ছে আমি মানুষ নই, পশু। মাথার ঠিক নেই, একটু মাথার ঠিক নেই—বুঝলেন।"

মৃদু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে পাপিয়া বলল—"বাবা—"

"ওই, আবার সুরু করছ বুঝি! এখনি কি বলেছি তোমাকে। কি বলেছি—"

"না আর বলব না, আর বলব না।"—ভয়ে বিবর্ণ হয়ে দুহাত জোড় করে বারবার একই কথা আবৃত্তি করতে লাগল সে।

"না, এরকমভাবে তো চলতে পারে না"—আদেশের ভঙ্গীতে পুরন্দরবাবু বললেন। ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল তাঁর পক্ষে।

"আপনি গরীব নন···এখানে এমন ভাবে থাকবার মানে কি—পাড়াটা জঘন্য···"

"পাড়াটা? কিন্তু আর হপ্তাখানেকের ভিতর চলে যাব আমরা বোধ হয়। এইতেই প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছে···গরীব নই তা ঠিক···কিন্তু···"

"খুব হয়েছে, আর বলতে হবে না" বলেই পুরন্দরবাবু থেমে গেলেন (ধৈর্য্যের সীমা সত্যিই অতিক্রম করেছিলেন তিনি) কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গী যেন

বলতে লাগল "খুব হয়েছে, আর বলতে হবে না। যা বলবে তা আমি জানি, আর কতটা সত্যি বলবে, তাও জানি।"

"শুনুন, একটা কথা বলছি। আপনি বলছেন বেশীদিন থাকবেন না, এক হপ্তা কিম্বা বড় জোর পনর দিন। এখানে আমার জানাশোনা একটি পরিবার আছে—খুবই জানাশোনা আমার সঙ্গে—গত কুড়ি বছর থেকে জানাশোনা। বাড়ির মালিক ভবেশ মল্লিক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এখানেই আছেন এখন, আপনি যে ব্যাপারে এখানে এসেছেন তাতে তিনিও সাহায্য করতে পারবেন। তারা এখন এখানেই আছে—যাদবপুরে প্রকাণ্ড বাড়ি তাদের—অনেক জায়গা। ভবেশবাবুর স্ত্রী আমার বোনের মতো। তার আটটি ছেলেমেয়ে। চলুন পাপিয়াকে তাঁর কাছে রেখে আসি···সময় নষ্ট না করে' এখুনি চলুন। আপনি যে ক'দিন এখানে থাকবেন পাপিয়া ওইখানেই থাকুক। খুব ভাল লোক তাঁরা—খুব খুশী হবেন, নিজের ছেলের মতন যত্ন করবেন ওকে। নিয়ে চলুন, বুঝলেন···"

অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছিলেন পুরন্দরবাবু এবং তা গোপন করার প্রয়োজনও অনুভব করছিলেন না।

"তা' কি করে' হয়"—নাক সিটকে পুরন্দরবাবুর দিকে আড়চোখে চেয়ে যুগল পালিত বললে।

"হবে না কেন?"

"বাঃ। যদিও আপনি একজন পুরোনো পরিচিত লোক—সেকথা বলছি না, কিন্তু হঠাৎ আমার মেয়েকে একটা অচেনা পরিবারে পাঠিয়ে দেওয়াটা কি ভাল? বিশেষত তাঁরা বড়লোক, আমার মেয়েকে কি চক্ষে দেখবেন তা যখন জানি না।"

"কি বিপদ! আমি তাদের চিনি যে, আমারই পরিবার বলে' ধরে' নিতে পারেন তাঁদের। বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা।"—সক্রোধে প্রায়

চীৎকার করে' উঠলেন পুরন্দরবাবু—ভবেশবাবুর স্ত্রী নীলিমা আমার কথা শুনলে একটুও আপত্তি করবেন না—আমার নিজের মেয়ে হলে যেমন যত্ন করতেন ঠিক তেমনি যত্ন করবেন। এতে আপত্তির কিছু নেই।"

"কিন্তু একটু কেমন যেন ঠেকছে আমার। আমাকে মাঝে মাঝে অন্তত দু' একবারও দেখা করতে যেতে হবে তো···হাজার হোক আমি ওর বাবা··· হি হি—তাছাড়া অত বড়লোক ওঁরা।"

"মোটেই বড়মানুষি চাল নেই ওদের, অত্যন্ত সাদাসিধে লোক। সেখানে অনেক ছেলেমেয়ে আছে, ও গেলে বেঁচে যাবে সেখানে। ওর ভালর জন্যই বলা, অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই আমার। আপনিও চলুন না কাল, পরিচয় করিয়ে দেব, আপনার নিজে একবার গিয়ে বলা উচিতও, মানে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। চলুন আজই যাই।"

"কিন্তু মানে, কেমন—"

"না, না কোন সঙ্কোচের কারণ নেই, আমি বলছি। আপনি বুঝতেও পারছেন সঙ্কোচের কোন কারণ নেই, ভান করছেন শুধু। শুনুন, আজ রাত্রে আমার বাসায় আসুন, রাত্রে সেখানে থাকবেন, ভোরে উঠেই বেরিয়ে যাব না হয়।"

"সত্যি কি উপকারী লোক আপনি—রাত্রে আপনার বাড়ীতে যেতে বলছেন?"

যুগল পালিত হঠাৎ গদগদ কণ্ঠে বলে উঠল—"আপনার এত ঋণ কি করে যে শোধ করব! কোথায় থাকেন তাঁরা?"

"যাদবপুর।"

"কিন্তু ওর জামা কাপড়ের কি হবে? অত বড়লোকের বাড়ীতে ওকে এই পোষাকে পাঠাতে, মানে, হাজার হোক আমি ওর বাবা তো—"

"কি বিপদ! বলছি তারা ভদ্রলোক, কারও পোষাক নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, তাছাড়া আপনার মেয়ের পোষাক এমন কি খারাপ, এখন

শোকের সময় বেশী সাজসজ্জা করলেই বরং খারাপ দেখাবে···পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেই হল···

"পাপিয়ার জামা কাপড় সত্যিই খুব অপরিচ্ছন্ন ছিল।

"জামা কাপড় ছেড়ে ফেলুক তাহলে"—যুগল পালিত ব্যস্ত হয়ে উঠল —"বাকী যা আছে গুছিয়ে নিক। ধোপার বাড়ীও গেছে কিছু।"

"একটা গাড়ি ডাকতে বলুন তাহলে তাড়াতাড়ি।"

যুগল বেরিয়ে গিয়ে গাড়ি ডাকতে বললে।

কিন্তু আর একটা মুস্কিল হল, পাপিয়া যেতে রাজি হল না। সভয়ে সে এতক্ষণ সব শুনছিল। পুরন্দরবাবু লক্ষ্য করলে দেখতে পেতেন যে তিনি যখন যুগলের সঙ্গে কথা কইছিলেন পাপিয়ার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল ক্রমশঃ।

"আমি যাব না"—মৃদু কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে সে বললে।

"দেখুন! ঠিক মায়ের মতো স্বভাব হয়েছে ওর, দেখছেন—"

"না, মোটেই আমি মায়ের মতো নই, মোটেই আমি মায়ের মতো নই—এমনভাবে পাপিয়া কথাগুলো বলতে লাগল যেন মায়ের মতো হওয়াটা তার একটা অপরাধ এবং বাবার কাছে সেজন্য সে ক্ষমা ভিক্ষা করছে।

"তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না..."

তারপর হঠাৎ সে পুরন্দরবাবুর দিকে ফিরে বললে—"আপনি যদি আমাকে নিয়ে যান তাহলে আমি···"

কথা শেষ করবার পূর্ব্বেই যুগল ক্ষেপে হাত ধরে হিড় হিড় করে' কোণের ঘরটায় টেনে নিয়ে গেল তাকে। তর্জ্জন গর্জ্জন চাপা কান্না শোনা যেতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে যুগল বেরিয়ে এসে জোর করে একটু হেসে বললে—"আসছে এবার। পুরন্দরবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। তার দিকে চাইতে প্রবৃত্তি হল না।

পুরন্দরবাবুর যে ঠাকুরটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সে এসে জিনিষপত্র স্থটকেশে গুছোতে লাগল। পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে বললে—

পাপিয়াকে আপনি নিয়ে যাচ্ছেন? আপনার বাড়ি বুঝি এখানে বেশ করছেন, বড় ভাল মেয়েটি, বড় লক্ষ্মী, এখানে যা কষ্টে ছিল—"

"তুমি যা করছ কর, ফাজিল কোথাকার—ধমকে উঠল যুগল।

"ফাজিল বলছেন কি মশাই? মিছে কথা বলিনি কিছু। এখানে যে সব কাণ্ড হয় তা ওটুকুন মেয়ের চোখের সামনে হওয়াই কি ভাল? ফাজিল! যেখানে গতর খাটাব সেখানেই অন্ন জুটবে দু'টি। হক কথা বলতে ভয় পাব না কখনও—"

গজগজ করতে করতে সে বেরিয়ে গেল। তারপর এসে বললে—"গাড়ি এসেছে" পাপিয়ার স্যুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে আবার বললে, "ওর ভাগ্য ভাল যে আপনি এসে গেছেন"—

পাপিয়া বেরিয়ে এল। বিবর্ণ মূর্ত্তি, আনত চক্ষু। কারুর দিকে চাইলে না, পুরন্দরবাবুর দিকে না, বাপের দিকেও না। যাবার সময় বাবাকে প্রণাম পর্য্যন্ত করল না। যুগল একটু কায়দা করে' তার কপোল চুম্বন করলে, আলতো আলতোভাবে পিঠটা চাপড়ে দিলে একটু, পাপিয়ার ঠোঁট চিবুক কেঁপে উঠল একবার—কিন্তু সে বাবার দিকে চাইল না। যুগলের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, হাত কাঁপতে লাগল—পুরন্দরবাবু যদিও প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন যুগলের দিকে না চাইতে, তবু তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। কোন রকমে এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি—এই তাঁর মনে হচ্ছিল খালি।

"আমার দোষ কি" ভাবছিলেন তিনি, "এতো হ'তই—হতে বাধ্য।"

সবাই নীচে নেমে এল। ঠাকুরটা পাপিয়াকে আদর করলে একটু। গাড়ী যখন চলতে সুরু করেছে তখন পাপিয়া হঠাৎ তার বাবার দিকে চেয়ে দু'হাত তুলে চীৎকার করে' উঠল—আর একটু হলে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ত—কিন্তু ঘোড়া ছুটো ছুটতে সুরু করেছে তখন।

৫

"অসুখ করবে কেন? গাড়ী থামাতে বলব? জল চাই?—"

পুরন্দরবাবু ভয় পেয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

পাপিয়া তাঁর দিকে ফিরে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ…চোখ দুটো জ্বলছে যেন।

"কোথা নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?" তীক্ষ্ণকণ্ঠে হঠাৎ প্রশ্ন করল সে।

"খুব ভাল জায়গা, দেখবে খুব ভাল লোক তারা। চমৎকার ফাঁকা বাড়ি, অনেক সঙ্গী পাবে, কত খেলা করবে তারা তোমার সঙ্গে ভয় কি, তোমার ভালর জন্যেই নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। রাগ কোরো না, পাপিয়া।"

পুরন্দরবাবুর পরিচিত কেউ এ সময় তাঁকে দেখলে বিস্মিত হতেন।

"উঃ—কি—কি ভয়ঙ্কর লোক আপনি—ক্ষোভে দুঃখে পাপিয়ার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল—জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে সে চেয়ে রইল শুধু।

"পাপিয়া, আমি—"

"আপনি পাজি, পাজি, পাজি, পাজি।"

নিজের হাত দুটো কচলাতে লাগল সে। পুরন্দরবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন।

"পাপিয়া মা—কেন এমন করছ, কেন এ কথা বলছ—"

"বাবা কি কাল আসবেন? সত্যি আসবেন?"

"হ্যাঁ। আমি নিজে নিয়ে আসব তাঁকে।"

"না, ঠিক ফাঁকি দিয়ে পালাবেন তিনি।"

"তোমার বাবা কি ভালবাসেন না তোমাকে ?"

"না, মোটেই না।"

"দুর্ব্যবহার করেন তোমার সঙ্গে ? বল—"

পাপিয়া নীরব। তারপর তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে রইল। অনেক সাধ্য সাধনা করলেন পুরন্দরবাবু, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কত কি বললেন, কত বোঝালেন, পাপিয়া শুনল বটে, কিন্তু মনে হল কিছু বিশ্বাস করছে না সে। কিন্তু সে যে শুনছে এতেই পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি। মানুষ মদ খেলে যে কি হয় তাই বোঝাতে লাগলেন তাকে। কোন ভয় নেই, তিনি তার আর তার বাবার যাতে কোন বিপদ না হয় তার ব্যবস্থা করবেন। পাপিয়া কি বুঝতে পারছে না যে তিনি তাদের কত আপন লোক, তাকে কত ভালবাসেন। পাপিয়া মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে চাইলে এবং তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়েই রইল। তিনি গল্প করতে লাগলেন যে তার মায়ের সঙ্গে কত বন্ধুত্ব ছিল তাঁর, তাদের বাড়িতে কতবার গেছেন তিনি। এ কথা শুনে পাপিয়ার মন একটু ভিজল মনে হল। ক্রমশ সে দু'একটা প্রশ্নের উত্তরও দিতে লাগল, যদিও সাবধানে এবং দু'এক কথায়। কিন্তু যা তিনি শুনতে চাইছিলেন তা কিছুতে বললে না সে, বাবার কথা একটি বললে না। পুরন্দরবাবু তার হাতখানা কথা বলতে বলতে ধরলেন এবং ধরেই থাকলেন। হাত সে টেনে নিলে না। নানা কথার মধ্যে একটা কথা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠল—বাবাকে সে মায়ের চেয়ে বেশী ভালবাসত ; বাবাই তাকে বরাবর বেশী স্নেহ করেছেন, মা তার দিকে ফিরেও চাইতেন না। কেবল মরবার আগে চুমো খেয়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন তিনি···অনেকক্ষণ···এখন সে মাকে খুব ভালবাসে, রোজ রাত্রে মনে পড়ে তাকে। পুরন্দরবাবু দেখলেন মেয়েটির আত্মসম্মান-জ্ঞান খুব আছে, কথায় কথায় এত কথা বলে ফেলে হঠাৎ যেন তার হুঁস হল যে সে অন্যায় করছে—চুপ করে' গেল আবার। কান্নাকাটি আর করলে না,

কিন্তু চুপ করে' রইল। বুনো জানোয়ারকে বন্দী করলে সে যেমন চুপ করে থাকে ঠিক তেমনি। একটা অচেনা জায়গায় যাচ্ছে বলেই যে তার কষ্ট হচ্ছিল তা ঠিক নয়। অন্য আর একটা কারণ ছিল।

পুরন্দরবাবু অনুভব করলেন সেটা। বাবার ব্যবহারে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল যে তার। এত সহজে তিনি আসতে দিলেন তাকে একটা অচেনা লোকের সঙ্গে। মনে হল তাঁর বোঝাটা পরের ঘাড়ে কোনক্রমে তুলে দিয়ে বাঁচলেন যেন?

"মেয়েটা অসুস্থ"—পুরন্দরবাবু ভাবছিলেন···"খুবই অসুস্থ···ভয়ে ভাবনায় আরও কাবু হয়ে পড়েছে। মাতালটা করেছে কি! এতক্ষণে বুঝতে পারছি সব' কোচোয়ানকে জোরে হাঁকাতে বললেন তিনি। যাদবপুর জায়গাটা ফাঁকা, বাগানও আছে ভদ্রলোকের একটা, ছেলেমেয়েগুলিও ভাল, নতুন জায়গায় গিয়ে শরীরটা সেরে যেতে পারে, তারপর···। তারপর যে কি হবে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না তাঁর মনে—ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতকে রঙীণ করে তুলেছিলেন মনে মনে। আর একটা কথাও নিঃসন্দেহে অনুভব করছিলেন তিনি, এখন যা তাঁর মনে হচ্ছে তা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নি, এ মনোভাব জীবনে বদলাবেও না আর কখনও।

"আঁকড়ে ধরবার মতো এই তো একটা পেয়েছি কিছু—সম্পূর্ণ জীবন একটা সানন্দে ভাবছিলেন তিনি।

অনেক চিন্তা তাঁর মনের উপর দ্রুতবেগে খেলে যাচ্ছিল, কিন্তু একটাকেও আমোল দিলেন না তিনি—পরে ভাল করে' ভেবে দেখা যাবে সব। ভাল করে' ভেবে না দেখা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটিকেই চমৎকার মনে হচ্ছিল, একেবারে অকাট্য—এ ছাড়া আর কি হওয়া সম্ভব! এই করতে হবে।

ভাবছিলেন—"সবাই মিলে বুঝিয়ে মাতালটার হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে একে। যাদবপুর ওদের বাড়িতেই থাকবে। দেবে না? ভাল করে' বোঝালে ঠিক দেবে। প্রথমে কিছুদিনের জন্য যাদবপুর রেখে চলে যাক···

তারপর ক্রমশঃ আমি আমার কাছে নিয়ে নেব। সেইটিই আমার উদ্দেশ্য। এ ছাড়া আর তো আমি কিছু চাই না। কিন্তু যুগলও হয় তো ওকে চায়। ওই হয় তো ওর জীবনের একমাত্র সুখ···তা হলে ওকে যন্ত্রণা দেয় কেন! যন্ত্রণা দিয়ে সুখ পায় বোধ হয়।"

অবশেষে এসে পৌঁছল তারা। ভবেশবাবুর বাড়িখানা সত্যিই চমৎকার। গাড়ি থামতেই একদল ছেলেমেয়ে কলরব করতে করতে এসে অভ্যর্থনা করল। পুরন্দরবাবু অনেকদিন আসেন নি। তাঁকে দেখে সবাই মহা খুসী—সবাই ভালবাসে তাঁকে। ওরই মধ্যে যারা বড়, গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই তারা চীৎকার করে উঠল—"আপনার মকোদ্দমার কি হল কাকাবাবু—কত বাকী আর—"

বড়দের অনুকরণে ছোটরাও তাই বলতে লাগল—মহা সোর গোল তুললে সবাই মিলে। নীলিমা দেবী বেরিয়ে এলেন, ভবেশবাবুও। তাঁরাও স্মিতমুখে মকোদ্দমার বিষয়ে জানতে চাইলেন।

নীলিমা দেবীর বয়স বছর সাঁইত্রিশ। একটু মোটা হয়ে গেছেন, কিন্তু তবু এখনও সুন্দরী বলা চলে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চোখে মুখে বেশ একটা সজীবতা আছে। ভবেশবাবুর বয়স বছর পঞ্চান্ন, চালাক চতুর বুদ্ধিমান এবং সর্ব্বোপরি সদাশয় ব্যক্তি। পুরন্দরবাবুর মতে এঁরাই আদর্শ গৃহস্থ। এই পরিবারটির প্রতি পুরন্দরবাবুর অনুরাগের আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। প্রায় কুড়ি বছর আগে, পুরন্দরবাবুর ছাত্রজীবন শেষ হয় নি তখনও, এই নীলিমা দেবীকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়েছিলেন তিনি। নীলিমা দেবীই তাঁর জীবনের প্রথম প্রণয়। প্রচণ্ড হাস্যকর এবং চমৎকার। নীলিমা দেবী কিন্তু বিয়ে করেছিলেন ভবেশ মল্লিককে। পাঁচ বছর পরে দেখা হয়েছিল আবার। সেই উদ্দাম প্রণয় ক্রমশঃ রূপান্তরিত হল শান্ত স্নিগ্ধ বন্ধুত্বে। বন্ধুত্বের মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল অবশ্য। এক অনির্দ্দিষ্ট ফল্গুধারার গোপন রসে তা সঞ্জীবিত থাকত যেন। কোন কালিমা ছিল না, গ্লানি ছিল

না, শুভ্রতা ছাড়া আর কিছু ছিল না এ বন্ধুত্বে। তাঁর জীবনে পবিত্র প্রণয়ের একটি মাত্র নিদর্শন বলে' বোধ হয় এর বিশেষ একটা মূল্য ছিল তাঁর কাছে। এই পরিবারের সংস্পর্শে এলে তাঁর সমস্ত মুখোস সমস্ত বহিরাবরণ খসে যেত যেন। সরল, উদার-সহৃদয় পুরন্দরবাবু আত্মপ্রকাশ করতেন, সহজ ভাবে। ছেলেদের সঙ্গে মিশতেন, তাদের আদর করতেন, নিজের সমস্ত দোষ ত্রুটি অকপটে স্বীকার করতেন, কোন রকম ভড়ং থাকত না। প্রায় বলতেন যে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এদের কাছেই এসে থাকবেন এবার। মুখের কথা নয়, সত্যি ইচ্ছে ছিল তাঁর।

পাপিয়ার কথা সব খুলে বললেন। বেশী বলবার দরকার ছিল না, পুরন্দরবাবুর অনুরোধই যথেষ্ট এ পরিবারের কাছে। নীলিমা সস্নেহে অভ্যর্থনা করে' নিলেন মাতৃহীন পাপিয়াকে এবং ছেলেমেয়েরা যখন পাপিয়াকে বাগানে টেনে নিয়ে গেল তখন তিনি পুরন্দরবাবুকে বললেন যে তাঁর যথাসাধ্য তিনি করবেন, পাপিয়ার কোন কষ্ট হবে না, পুরন্দরবাবু নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আধঘণ্টা পরেই তিনি বললেন—"এবার আমাকে যেতে হবে।" সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কতদিন তিনি আসেন নি, এসেই বলছেন যেতে হবে। আধঘণ্টা পরেই। কিন্তু পুরন্দরবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন. তাঁর অধৈর্য্য দেখেও অবাক লাগল সকলের। পুরন্দরবাবু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে পরের দিনই আবার আসবেন, আজ কিন্তু যেতেই হবে। সকলেই লক্ষ্য করল বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন তিনি। হঠাৎ উঠে তিনি নীলিমা দেবীকে বললেন—"শোন, একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে, চল ওপরে চল।"

পাশের ঘরে গিয়ে বললেন—"অনেকদিন আগে তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে? তোমাকেই বলেছিলাম খালি, ভবেশবাবু এর বিন্দুবিসর্গ কিছু জানেন না। আমার সেই বর্দ্ধমানের ব্যাপারটা?"

"মনে আছে বই কি, প্রায়ই সে গল্প করতেন যে"—মৃদু হেসে নীলিমা বললেন।

"গল্প নয়, সত্য কথা, আর তোমাকেই কেবল বলেছিলাম তা। তার পরিচয় তোমাকে দিই নি। সে এই যুগল পালিতের স্ত্রী। সে এখন মারা গেছে—পাপিয়া তারি মেয়ে—মানে আমারই মেয়ে।"

"সত্যি!"

"সত্যি—কোন ভুল নেই এতে"—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন তিনি।

অতিশয় উত্তেজিতভাবে সংক্ষেপে যতটা পারলেন বললেন আবার—সবটাই বললেন।

অপর্ণার নামটি ছাড়া নীলিমা সবই শুনেছিলেন আগে। পুরন্দরবাবু নামটা আগে বলেন নি—কারণ তাঁর ভয় ছিল যদি কখনও অপর্ণা পালিতের সঙ্গে নীলিমার দেখা হয়ে যায় তখন সে হয়তো ভাববে—পুরন্দরবাবুর মতো লোক—এই মেয়েকে এত ভালবেসেছিলেন! কি আশ্চর্য্য! নীলিমাকে পর্য্যন্ত নামটা বলেন নি তাই।

"ওর বাপ কিছু জানে না?"—নীলিমা প্রশ্ন করলেন।

"তা, মানে—হ্যাঁ—সন্দেহ—জানেই ধরতে হবে' ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হয়নি এখনও আমার কাছে। হ্যাঁ জানে বই কি—কাল আজ দু'দিনই যা লক্ষ্য করলাম তাতে তাই তো মনে হয়। কিন্তু কতটা জানে তাই আমাকে জানতে হবে। তাই আমি যেতে চাইছি এখুনি, আজ রাত্রে তার আসবার কথা আছে আমার বাসায়। আমি কিছুতে বুঝতেই পারছি না জা লে কি করে'—সমস্তটা জানা কি করে সম্ভব! কিন্তু জেনেছে। পূর্ণ গাঙ্গুলীর সম্বন্ধে যে জেনেছে তাতে আর সন্দেহ নেই! কিন্তু আমার কথা জানলে কি করে? অপর্ণা খুব চতুর মেয়ে ছিল—কারও নাম বলবার পাত্রী সে নয়। তা ছাড়া জানই তো—স্বামীদের অদ্ভুত একটা অন্ধ বিশ্বাস থাকে স্ত্রীদের সম্বন্ধে। স্বর্গের দেবতাকে তারা বরং অবিশ্বাস করে কিন্তু স্ত্রীকে নয়।

যুগলের তো কথাই নেই। না, না, মাথা নেড়ো না—আমারই ষোল আনা দোষ তা আমি স্বীকার করছি। শুধু এখন নয়—বহুদিন থেকেই স্বীকার করছি আমিই দোষী।···সে যে সব জানে একথাটা এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আজ সকালে যে, তার কাছে আমি প্রায় স্বীকার করে' ফেলেছিলাম সব। কাল রাত্রে হঠাৎ দেখা হয়ে এমন লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম, এমন অভদ্র ব্যবহার করে বসেছিলাম—ছিছি কি যেন হয়ে গেল একটা! মদ খেয়ে এসেছিল লোকটা বুঝলে? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে মদ খেয়েছিল বলেই এসেছিল. বুকের জালাটা চাপতে পারে নি—তার প্রতি কত বড় অন্যায় যে করা হয়েছে তাই জানাতেই এসেছিল—মানে, না এসে পারে নি। অন্যায়টা কে যে করেছে তা-ও সে জানে···সেই কথাটাই বলতে এসেছিল···তা না হলে রাত দুপুরে অমন করে' আসার মানে হয় না কোনও। দোষ দিচ্ছি না তার···আমি হলেও ওই করতুম। কাল আজ দু'দিনই আমি গোপন করতে পারিনি নিজেকে। হড়বড় করে' কি সব যে বলে' বসলাম···আঃ! আর ঠিক এমন সময় এল যখন আমার মাথার ঠিক নেই। পাপিয়াকেও ঠিক যন্ত্রণা দেয় ও। আমার মনে হয় মনের ঝাল ঝাড়বার জন্যে···মেয়েটার ওপর দিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে! হ্যাঁ, প্রতিশোধ নিতে পারে ও···যদিও মানুষ নয়, একটা কীট-বিশেষ...কিন্তু বিষটুকু ঠিক আছে। আগে লোকটা ভদ্র ছিল—যদিও মেরুদণ্ড বলে কিছু ছিল না। এই ধরণের লোকরাই উচ্ছন্ন যায় শেষ পর্য্যন্ত। আমি কোন অন্যায় করতে চাই না ওর ওপর—ওর যথাসাধ্য উপকার আমি করব। আমিই দোষী···আমিই ওর জীবনটা নষ্ট করে' দিলাম হয় তো। লোকটা সত্যিই বন্ধু বলে' ভাবত আমাকে। একবার বর্দ্ধমানে হাজার দুই টাকার দরকার হয়েছিল আমার—চাইবামাত্র দিয়ে দিলে, একটা রসিদ পর্য্যন্ত চায় নি···বুঝলে···"

"আপনি বড্ড বেশী অস্থির হয়ে পড়েছেন"—নীলিমা বললেন—

"আপনার জন্যে ভাবনা হচ্ছে আমার। পাপিয়াকে নিজের মেয়ের মতো

যত্ন করব আমি—সে বিষয়ে কোন চিন্তা করবেন না। কিন্তু অনেক কিছু গড়াতে পারে এর থেকে, আপনি সাবধানে কথাবার্ত্তা কইবেন তাঁর সঙ্গে—উচ্ছ্বাসের মুখে যা তা ব'লে বসবেন না যেন। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।"

পুরন্দরবাবুকে বিদায় দেবার জন্যে সবাই বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ছেলেরাও পাপিয়াকে নিয়ে এল বাগান থেকে। পাপিয়ার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে তাদের। পুরন্দরবাবুকে দেখে পাপিয়া মাথা নীচু করলে—লজ্জায় বোধ হয়। পুরন্দরবাবু সকলের সামনে তার মুখচুম্বন করলেন, বারবার বললেন যে কালই তিনি যুগলবাবুকে নিয়ে আসবেন। পাপিয়া চুপ করে' মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তাঁর হাত দুটো ধরে' সকরুণ দৃষ্টিতে চাইলে তাঁর দিকে, মনে হল কি যেন বলবে। তিনি তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়লেন।

"কি, পাপিয়া"—

পাপিয়া এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, তারপর তাকে নিয়ে ঘরের কোনে চলে গেল একেবারে।

"কি বলবে, কি হয়েছে—"

চুপ করে' রইল সে, যেন কথা বলতে পারছে না। নির্নিমেষ কালো চোখের দৃষ্টি তাঁর মুখের উপর নিবদ্ধ করে' নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে মুখে সমস্ত ভঙ্গিমায় ফুটে উঠল ভয়—কিসের একটা আতঙ্ক।

"গলায় দড়ি দেবে···" চুপি চুপি বললে, স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো।

"কে গলায় দড়ি দেবে?"

"বাবা। কাল রাত্রে গলায় দড়ি দিচ্ছিল। আমি দেখতে পেয়েছিলাম। আমাকে বলেছে গলায় দড়ি দিয়ে মরব। অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছে··· কাল আমি দেখেছিলাম—"

"কি বাজে কথা বলছ"—মুখে একথা বললেও পুরন্দরবাবু মনে মনে

বিস্মিত হলেন। হঠাৎ পাপিয়া তাঁর পায়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল…কি যে বলল কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি…কি করবেন ভেবে পেলেন না। অশ্রুসিক্ত বেদনাতুর দৃষ্টি তুলে সে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। পাপিয়ার এই মূর্তিই আঁকা হয়ে রইল তাঁর মনে‥ ভবিষ্যতে স্বপ্নে জাগরণে এই মূর্তিই দেখতে পেতেন তিনি।

হঠাৎ তাঁর হিংসে হল। মেয়েটা সত্যিই কি বাপকে এত ভালবাসে! সমস্ত রাস্তা এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে এলেন। বুকটা পুড়ে যেতে লাগল। আজ সকালেই তো বললে যে সে মাকে খুব ভালবাসত। তাকে বোধ হয় ঘৃণা করে! বাবা গলায় দড়ি দেবে মানে? মাতালটা সত্যিই আত্মহত্যা করবে না কি।…না, ব্যাপারটা জানতে হবে। আমি অন্য ভঙ্গিতে সব জানতে হবে—দেরি করলে চলবে না।

৭

জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

"সকালে এমন গুলিয়ে গেল সব। ভাল করে' ভেবে দেখবারই সময় পেলাম না"—পাপিয়ার কথা ভাবতে ভাবতেই আসছিলেন পুরন্দরবাবু—"এবার কিন্তু তলিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে সত্যি।" তলিয়ে দেখবার আগ্রহাতিশয্যে একবার ভাবলেন সুগলের বাসাতেই যাওয়া যাক, কিন্তু তখনই আবার মনে হল—"না, আমার বাসাতেই ও আসুক। ইতিমধ্যে আমি আমার মকোর্দ্দমার কাজ খানিকটা সেরে ফেলি।"

কাজ সারবার জন্য কাগজপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি সুরু করলেন, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলেন যে কাজ এগোচ্ছে না, বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। পাঁচটার সময় চা খাবার জন্যে যখন বেরুলেন, তখন তাঁর প্রথম মনে হল যে সত্যিই বোধহয় তিনি নিজেই সব করতে গিয়ে আরও জটিল করে' তুলেছেন তাঁর মকোর্দ্দমাকে, তাঁর উকীল তাঁকে দেখলেই যে আত্ম-গোপন করবার চেষ্টা করে—ঠিকই করে বোধ হয়। কেন হাঁপিয়ে মরছি আমি। কথাটা ভেবেই হাসি পেল তাঁর—"একথাটা কাল মনে হলে কিন্তু কষ্ট হ'ত।" তখনই কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন আবার। অধীরতা আরও বেড়ে গেল। এলোমেলো নানা চিন্তা জাগতে লাগল মনে—বিশৃঙ্খল পরস্পর-সম্বন্ধ-হীন চিন্তা সব—যার কোন মাথামুণ্ড নেই। ক্রমশঃই অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন।

"নাঃ ওই লোকটাকে চাই"—শেষ পর্য্যন্ত ভাবলেন "ওর রহস্য সমাধান না করতে পারলে কিছুই করা যাবে না।"

সাতটার সময় বাড়ি ফিরে যুগল পালিতকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন তিনি, তারপর রাগ হল, তারও খানিক পরে কেমন যেন দমে' গেলেন। শেষটা ভয় হতে লাগল।

"শেষ পর্য্যন্ত কি যে হবে ভগবানই জানেন" বারবার আবৃত্তি করতে লাগলেন, বারবার ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সারা ঘরময়, বারবার ঘড়ি দেখতে লাগলেন। অবশেষে, নটার সময় যুগল পালিত এল। পুরন্দরবাবুর মনে হল "লোকটা যদি আমাকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে থাকে তাহলে এর চেয়ে বড় সুযোগ আর পাবে না। কিছু মাথার ঠিক নেই, একদম নেই"—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আত্মস্থ হলেন তিনি, মনের জোর আবার যেন ফিরে এল হঠাৎ।

স্বচ্ছন্দ সাবলীল কণ্ঠেই তিনি বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যুগল পালিতও একটু বাঁকা হাসি হেসে স্বচ্ছন্দভাবে বসে পড়ল সোফাটায়। তার স্বাচ্ছন্দ্য দেখে অবাক হলেন পুরন্দরবাবু, আগের রাত্রের মতো মোটেই নয়। এ যেন অন্য লোক।

অতিশয় শান্তভাবে পুরন্দরবাবু সব বলে গেলেন। পাপিয়া কি ভাবে গেল, কত ভদ্রভাবে তাঁরা অভ্যর্থনা করলেন তাকে, পাপিয়াকে ওখানে নিয়ে যাওয়াতে কতটা ভাল হল। ক্রমশঃ পাপিয়ার বদলে কথাটা ভবেশবাবুদের সম্বন্ধে হতে লাগল। কি চমৎকার লোক ওঁরা, তাঁর সঙ্গে কতদিনের আলাপ, ভবেশবাবু নিজে কত সহৃদয়, অথচ প্রভাবশালী লোক—ইত্যাদি। যুগল শুনে যাচ্ছিল—খুব যে মন দিয়ে তা নয়। মাঝে মাঝে চোখ তুলে চেয়ে দেখছিল—একটা তীব্র ক্রূর হাসিও যেন উঁকি দিচ্ছিল চোখের কোণ থেকে।

"বড্ড খামখেয়ালী লোক আপনি"—বলেই অতিশয় বিশ্রী রকমের একটা হাসি হাসলে সে।

"আপনার মেজাজটা আজ যেন খারাপ বলে' মনে হচ্ছে"--পুরন্দরবাবু বললেন।

"হবেই না বা কেন! আর পাঁচজনের যখন হয়, আমারই বা হবে না কেন"—হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠল যুগল, মনে হল যেন ওৎ পেতে ছিল।

"তাতো বটেই—হেসে উত্তর দিলেন পুরন্দরবাবু—"না, আমি ভাবছিলাম কিছু হয়েছে বুঝি।"

"হয়েছে বই কি!"—যুগল এমনভাবে উত্তর দিলে যেন কোন কিছু হওয়াটাই একটা কৃতিত্ব।

"কি হয়েছে?"

যুগল চুপ করে' রইল কিছুক্ষণ।

"পূর্ণবাবু শেষকালে ঠকালেন আমায়—পূর্ণ গাঙ্গুলী কলিকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের শিরোভূষণ একজন…"

"দেখা করলেন না আপনার সঙ্গে? দারোয়ান বুঝি বললে বাড়ীতে নেই?"

"এবার বাড়িতেই ছিলেন, আমি প্রবেশের অনুমতিও পেয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল—কিন্তু তিনি মারা গেছেন! কাল মহাসমারোহ-সহকারে তাঁর শবযাত্রা বেরুবে শুনলাম।"

"সে কি! পূর্ণবাবু মারা গেছেন?"

পুরন্দরবাবু অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন, যদিও বিস্মিত হবার কারণ ছিল না কিছু। "হ্যাঁ। ছ' বছর যিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন কাল দুপুরবেলা তিনি মারা গেছেন, অথচ আমি খবর পাই নি কিছু। কাল দুপুরবেলাই ভাবছিলাম ভদ্রলোকের খবরটা নিয়ে আসি একবার। আহা, মেনিন্‌জাইটিস হয়েছিল! দেখা করবার সুযোগ যখন ঘটল, গিয়ে মড়া দেখলুম। একেই বলে কপাল! তাদের বলে এলাম, বড় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আমাদের। কিন্তু ছ' বছর ধরে আমার সঙ্গে উনি যে ব্যবহারটা করেছেন—দীর্ঘকালের এই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব—সে সম্বন্ধে এখন কি করা উচিত বলুন তো। ওঁর জন্যেই আমার এখানে আসা…"

"তা আর কি হবে বলুন"—পুরন্দরবাবু হেসে বললেন—"উনি তো আর ইচ্ছে করে' মারা যান নি।"

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে যুগল বলে উঠল—"স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করছি যে!" একটা অদ্ভুত কুটিল হাসি খেলে গেল তার চোখে। পুরন্দরের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ, সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন বিষ ক্ষরিত হচ্ছে যেন। কিন্তু এভাব বেশীক্ষণ থাকল না। পরক্ষণেই তার অধরেও ব্যঙ্গ-তিক্ত হাসি ফুটে উঠল একটা ধীরে ধীরে।

"ও কথার মানে কি" —যেন কিছু বোঝেন নি এমনিভাবে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"স্বামীর ভূমিকা মানে স্বামীর ভূমিকা—ভূমিকা" টেবিল চাপড়ে উত্তর দিল যুগল।

"আপনি অভিনয় করছেন?"

"নিশ্চয়! শুধু অভিনয় করছি না—মহত্ত্ব সহকারে করছি"—সমস্ত দন্ত পাঁতিকে বিকশিত করে' একটা অতি কুৎসিৎ হাসি হাসলে যুগল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

"আপনার বুকের পাটা আছে, একথা মানতেই হবে"—পুরন্দরবাবু বললেন অবশেষে।

"কেন, একথা বললাম বলে? তাহলে আনান কিছু—বেশী না এক বোতল।"

"বেশ তো, কি খাবেন আপনি?"

"শুধু আমি কেন, আপনিও খাবেন আজ। খাবেন না?" একটা আদেশের সুর যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল যুগলের কণ্ঠস্বরে—চোখের দৃষ্টি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল যেন।

"বেশ তো। কি আনাব? শ্যামপেন?"

"হ্যাঁ, শ্যামপেনই ভাল। হুইস্কি এখন চলবে না।"

পুরন্দর উঠে গিয়ে চাকরকে হুকুম করলেন।

"দীর্ঘ ন'বৎসর পরে পুনর্মিলন উৎসবটা বেশ করে' জমানো যাক—"

একটা বেখাপ্পা বেসুরো হাসি হেসে যুগল বাগিয়ে বসল।

"পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে এক আপনিই রইলেন শুধু। পূর্ণবাবু গেলেন।" কবি গেয়েছেন—

"মধুনিশি পূর্ণিমার আসে যায় বারবার—
সে তো রে ফেরে না আর যে গেছে চলে"

ভঙ্গীভরে হাত দুটি উলটে হাসিমুখে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে রইল।

"যা বলবি বলে' ফেল না ব্যাটা—ইঙ্গিত ফিঙ্গিত ভাল লাগে না আর" পুরন্দরবাবু মনে মনে বলছিলেন। রাগ ক্রমশই বাড়ছিল তাঁর, আত্মসম্বরণ করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল।

"আচ্ছা একটা কথা বলুন তো" বিরক্তি চেপে পুরন্দরবাবু বললেন, "পূর্ণ গাঙুলী যদি আপনার প্রতি অন্যায়ই করেছিলেন তাঁর মৃত্যুতে তো আপনার আনন্দিতই হওয়া উচিত। আপনি ক্ষুব্ধ হচ্ছেন কেন?"

"আনন্দিত! আনন্দিত হতে যাব কেন?"

"আমার তো মনে হয় আনন্দিত হওয়াই উচিত।"

"হি—হি! আমার মনোভাব ঠিক ধরতে পারেন নি আপনি। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন—শত্রু মরে যাওয়া ভাল, কিন্তু বেঁচে থাকা আরও ভাল। হি—হি!"

"কিন্তু আপনি তো তাকে একটানা পাঁচ বচ্ছর দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ক্লান্তি আসা উচিত ছিল"—একটু অভদ্ররকম খোঁচা দিয়ে পুরন্দরবাবু উত্তর দিলেন।

"আপনি কি মনে করেন আমি তখন জানতাম···আমি কি জানতাম তখন?" যুগল পালিতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। অন্ধকার কোণ থেকে লাফিয়ে হঠাৎ আলোতে বেরিয়ে এল যেন সে। বেরিয়ে এসে

বাঁচল যেন। এতদিন ধরে' যে জটিল প্রশ্নটার সম্মুখীন হতে চাইছিল সে কিন্তু পারছিল না—হঠাৎ আড়াল আবডালে সরে' যাওয়াতে চক্ষুলজ্জার দায় থেকে সে বাঁচল যেন।

"আমাকে আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো?"

অপ্রত্যাশিত রকম নতুন একটা দীপ্তি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। চেহারাই বদলে গেল। এতক্ষণ তার মুখভাবে কুৎসিৎ কদর্যতা ছাড়া আর কিছু ছিল না। পুরন্দরবাবু ঘাবড়ে গেলেন একটু।

"আপনি কিছুই জানতেন না এ কি সম্ভব!

"আমি জানতাম সেইটেই কি সম্ভব? সেইটেই কি সম্ভব? আশ্চর্য্য লোক এই শহরের ভদ্রলোকেরা! আপনাদের বিচারে মানুষে আর কুকুরে কোন তফাত নেই, আর আপনারা সবাইকে বিচার করেন নিজেদের হীন মানদণ্ড দিয়ে। সুস্থ মস্তিষ্কে বহাল তবিয়তেই একথা বলছি আপনার মুখের উপর!"

প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল সে টেবিলের উপর। মেরেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, কারণ শব্দটা খুব জোরে হ'ল।

পুরন্দরবাবু গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

"শুনুন যুগলবাবু, আপনি জানতেন কি জানতেন না তা আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক, তা আপনি বুঝতেই পারছেন। আপনি যদি না জেনে থাকেন ভালই, যদিও···আর একটা কথাও আমি বুঝতে পারছি না, আপনি এসব কথা আমাকেই বা বলছেন কেন—"

"আপনাকেই ঠিক বলছি না আমি, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে লক্ষ্য করেই আমি বলি নি কিছু"—চক্ষু আনত করলে যুগল।

শ্যামপেন নিয়ে চাকর প্রবেশ করল।

"এই যে"—সোল্লাসে যুগল বলে উঠল। চাকরটা আসাতে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

"গ্লাস আন দিকি বাবা এইবার। বাঃ, আর কিছু চাই না। খুলেই এনেছ, বেশ বেশ। হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি ত্যজিতে মুকুট দণ্ড—আসুন। যাও—তুমি যাও..."

চাকরটা চলে গেল। যুগলের উৎসাহ সঞ্জীবিত হল, পুরন্দরবাবুর দিকে সে উদ্ধত দৃষ্টি মেলে চাইলে আবার।

"স্বীকার করুন"—হঠাৎ সে বলে উঠল—"স্বীকার করুন যে এসব মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয় আপনার কাছে—রীতিমত প্রাসঙ্গিক, ভীষণ কৌতূহলজনক। এত বেশী যে এই মুহূর্তে যদি আমি সবটা না বলে' চলে' যাই রাত্রে ঘুম হবে না আপনার।"

"কি যে বলছেন—"

"ঠিক বলছি।"

একটা অদ্ভুত হাসিতে তার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আসুন সুরু করা যাক—"

গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল। একগ্লাস পুরন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে।

"আসুন, প্রথমেই প্রিয় পূর্ণবাবুর উদ্দেশ্যে পূর্ণ গ্লাস শেষ করা যাক—" বলেই গ্লাসটা তুলে ঢক ঢক করে শেষ করে' ফেললে।

"আমি পূর্ণবাবুকে আর টানব না।"

"কেন! অমন একটা পুণ্য-স্মৃতি!"

"আপনি এখানে আসবার আগেই খেয়ে এসেছিলেন একটু, নয়?"

"হ্যা, একটু। কেন?"

"না, এমনি। কাল রাত্রে আমার মনে হয়েছিল, আজ সকালে আরও বেশী করে' মনে হয়েছিল যে অপর্ণার মৃত্যুটা বড্ড মর্ম্মান্তিক হয়েছে আপনার পক্ষে।"

"মর্ম্মান্তিক হয় নি তা-ই বা কে বললে আপনাকে এখন?"

ঠিক যেন স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে উঠল যুগল।

"আহা, আমি সে ভাবে বলছি না কথাটা। পূর্ণবাবুর সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা ভুলও তো হতে পারে—এতবড় গুরুতর ব্যাপারে ভুল ধারণা নিয়ে থাকলে—"

যুগলের মুখে চতুর হাসি ফুটে উঠল একটা। বাঁ চোখটা ছোট করে' কুঞ্চিত করলে সে একবার।

"পূর্ণ গাঙ্গুলীর ব্যাপার কি করে' আবিষ্কার করলাম তা জানতে আগ্রহ হচ্ছে আপনার নিশ্চয়।"

পুরন্দরবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন তিনি।

"না, আমার আগ্রহ হবে কেন!"

"বোতল-ফোতল সুদ্ধ ব্যাটাকে এই মুহূর্তে দূর করে' দিলে কেমন হয়" পুরন্দরবাবু মনে মনে গজরাচ্ছিলেন। হঠাৎ সমস্ত মুখটা আরও লাল হয়ে গেল তাঁর।

"সব বলছি, ব্যস্ত হবেন না। আপনার কৌতূহল হয়েছে তা বুঝতে পারছি, হাওয়াটাই তো জীবন্ত প্রাণের লক্ষণ, আপনি যে একটা প্রাণবন্ত লোক তাতে আর সন্দেহ কি। হি—হি। দিন একটা সিগারেট দিন··· গত ফাল্গুনের পর থেকে আর···"

"এই যে নিন—"

"গত ফাল্গুনের পর থেকেই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, তারপর থেকেই উচ্ছন্ন গেছি, বুঝলেন? কেমন করে' কি হল সব বলছি—শুনুন। যক্ষ্মা ব্যাধিটা, আপনি তো জানেন, ভারী এক অদ্ভুত ব্যায়রাম। যক্ষ্মা রোগী কখনও বিশ্বাস করে না যে তার মৃত্যু আসন্ন—অথচ ফট করে' যে কোন মুহূর্ত্তে মারা যেতে পারে সে। মৃত্যুর ঠিক পাঁচ ঘণ্টা আগে অপর্ণা প্ল্যান করছিল যে পনর দিন পরে সে তার পিসির কাছে বেড়াতে যাবে—পিসি থাকে ত্রিশ মাইল দূরে। অনেক মেয়ের একটা বদ অভ্যাস আছে আপনি জানেন বোধ হয়—শুধু মেয়েদের কেন তাদের প্রণয়ীদেরও আছে—প্রেমপত্র-

গুলি তারা পুড়িয়ে না ফেলে সযত্নে রেখে দেয়। কাগজের টুকরোটি পর্য্যন্ত তুলে রাখে। অনেক সময় আবার সন তারিখ মিলিয়ে গুছিয়ে রাখে থাক করে'। এতে যে কি সুখ পায় তারা—তা তারাই জানে। হয় তো স্মৃতিসুখ, বলতে পারি না। অপর্ণা পিসির বাড়ি বেড়াতে যাবার আয়োজন করছিল যখন মৃত্যুর পাঁচ ঘণ্টা পূর্ব্বে—তখন বুঝতেই পারছেন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার আশা ছিল যে ভাল হয়ে যাবে। ফলে হল কি—সে যখন হঠাৎ মারা গেল তখন তার ড্রয়ারে রৌপ্য এবং মুক্তাখচিত একটি আবলুস কাঠের বাক্স থেকে গেল। চমৎকার বাক্সটি। চাবিও সেই ড্রয়ারেই ছিল। সেই বাক্সেই সব ছিল—সমস্ত। বিগত কুড়ি বছরের সমস্ত চিঠিপত্র সন তারিখ মিলিয়ে চমৎকার করে' গুছিয়ে রেখে দিয়েছিল সে। পূর্ণবাবু একটু কবি-প্রকৃতির লোক ছিলেন (একবার একটা মাসিক পত্রে প্রেমের গল্পও লিখেছিলেন বুঝি একটা)—তার চিঠি প্রায় শতাধিক ছিল—সবই তো পাঁচ বছর ধরে' লিখেছেন। কতকগুলো চিঠিতে অপর্ণা আবার নিজের হাতে নোটও লিখেছে কিছু কিছু। স্বামীর দিক দিয়ে জিনিসটা বেশ উপভোগ্য—কি বলেন?"

পুরন্দরবাবু বিদ্যুৎগতিতে ভেবে দেখলেন—না, তিনি কোন চিঠি অপর্ণাকে লেখেন নি। না কিচ্ছু না। দুখানা চিঠি অবশ্য লিখেছিলেন —কিন্তু দুটোতেই অপর্ণার নির্দ্দেশ অনুসারে ঠিকানা ছিল যুগলের নামে। অর্থাৎ দুটোই নিরামিষ চিঠি। অপর্ণার শেষ চিঠির উত্তরই দেন নি, দেবার প্রবৃত্তি হয় নি।

গল্প শেষ করে' যুগল মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে পুরন্দরের দিকে চেয়ে রইল। চেয়েই রইল পুরো এক মিনিট ধরে'।

"আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না যে—"

"কোন কথার?"

"জিনিসটা স্বামীর পক্ষে বেশ উপভোগ্য, কি না—"

"আমি আর কি বলব"—পুরন্দরবাবু উঠে পড়লেন এবং ঘরের চার দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

"আপনি ঠিক ভাবছেন—এ লোকটা কি, ঘরের কথা বাইরে বলে' বলে' বেড়াচ্ছে! হি—হি। ঠিক ভাবছেন আপনি—আপনাকে চিনি তো—ভীষণ রুচি-বাগীশ লোক আপনি—"

"আমি কিছুই ভাবছি না। আপনার আচরণে অপ্রত্যাশিত কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো। পূর্ণ গাঙ্গুলীকে জীবিত কেন চাইছিলেন তা-ও বুঝতে পারছি, আপনার এ দাবীকে শ্রদ্ধা করতেও ইচ্ছে করছে—"

"আচ্ছা, পূর্ণবাবুকে পেলে কি করতুম আপনি মনে করেন—"

"তা কি ক'রে' বলব ?"

"আপনি বোধ হয় ভাবছেন ডুয়েল লড়তুম—অ্যাঁ নয় ?"

"আঃ কি বিপদ"—একটু অধীরভাবে বলে' উঠলেন পুরন্দরবাবু, তিনি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না—"আমার তো মনে হয় এ অবস্থায় লোকে বাজে বকবক করে না, অতীত নিয়ে হা-হুতাশ করে না, নালিশও করে না কারও উপর, কোন রকম বাজে ভাবভঙ্গীর ধার দিয়েই যায় না—এ অবস্থায় যারা ভদ্রলোক তারা যা করবার সোজা করে' ফেলে।"

"হি—হি—হি। আমি বোধ হয় ভদ্রলোক নই—"

"সে আপনি বুঝুন। যদি ভদ্রলোক নন তাহলে জীবিত পূর্ণ গাঙ্গুলীকে চাইছিলেন কেন…"

"পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করাটা অন্যায় কি! ঠিক এমনি ভাবে এক বোতল মদ আনিয়ে খেতাম দু'জনে—"

"তিনি মদ খেতেনই না আপনার সঙ্গে।"

"কেন? আপনি খাচ্ছেন তো! আপনার চেয়ে কি হিসেবে বড় তিনি—"

"আমিও আপনার সঙ্গে বসে' মদ খাচ্ছি না ঠিক।"

একটু অপ্রতিভ ও মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন পুরন্দরবাবু।

"ও! হঠাৎ আভিজাত্য উথলে উঠল যে আপনারও দেখছি।"

"মহা জুলুমবাজ লোক দেখছি আপনি। নিরীহ স্বামী ছাড়া আপনি আর যে কিছু হতে পারেন তা ধারণা ছিল না আমার!"

"নিরীহ স্বামী! মানে?"—বুগল কান খাড়া করে' উঠে বসল।

"মানে খুব সরল। স্বামী বহুপ্রকার হয়—নিরীহ স্বামী একটা টাইপ।"

"আর জুলুমবাজ? জুলুমবাজ বললেন যে এখনি—"

"ঠাট্টাও বোঝেন না। উঠুন, বাড়ী যান এবার—"

"জুলুমবাজ কথাটি কি অর্থে ব্যবহার করলেন বলুন না খুলে—দোহাই আপনার!—জুলুমবাজ—অ্যাঁ—? জুলুমবাজ!"

"যথেষ্ট হয়েছে, বাড়ি যান এবার। উঠুন, অনেক রাত হয়েছে।"

পুরন্দরবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছিল।

"যথেষ্ট হয় নি মোটেই" 'ফোঁস করে' উঠল বুগল, "আপনার হয় তো আর ভাল লাগছে না কিন্তু যথেষ্ট হয় নি মোটেই। আমার সঙ্গে বসে মদ খেতেই হবে আপনাকে। না খেলে ছাড়ছি না। আসুন—গ্লাস নিন।"

"আপনি যাবেন কি না?"

"যাব। কিন্তু তার আগে মদ খাব। আর আপনাকে আমার সঙ্গে মদ খেতে হবে। খেতেই হবে।"

তার কণ্ঠস্বরে কোন রসিকতা বা ভাঁড়ামির সুর ছিল না। হঠাৎ সে অন্য লোক হয়ে গেল যেন। পুরন্দরবাবু বিস্মিত হয়ে গেলেন।

"আসুন, খান এক গ্লাস আমার সঙ্গে, ক্ষতিটা কি?"

পুরন্দরবাবুর হাতটা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইল বুগল। স্পষ্ট বোঝা গেল এক সঙ্গে মদ খাওয়ার গুরুতর মানে আছে অন্য কিছু।

"কিছু ক্ষতি নেই—আসুন। কিন্তু বোতলে আর আছে কি কিছু?"

"হ্যাঁ, ঠিক দু'টী গ্লাস আছে। রীতিমত সভ্য রীতিতে গ্লাস 'ড্রিংক্' করতে হবে কিন্তু—"

সভ্য রীতি অনুযায়ী গ্লাস ড্রিংক্ করা হ'ল। শেষ করে পুরন্দরবাবু বললেন—"আচ্ছা লোক আপনি।"

যুগল নিজের রগ দু'টো টিপে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করে'। পুরন্দরবাবু প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করতে লাগলেন এইবার যুগল তার শেষ এবং আসল কথাটি বলবে। কিন্তু যুগল কিছুই বললে না, চেয়ে রইল কেবল এবং একটু পরে' তাঁর দিকে ফিরে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

পুরন্দরবাবু আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। চীৎকার করে' বলে উঠলেন, "কি বিপদ, কি চান আপনি আমার কাছে! মাতলামি করবার আর জায়গা পেলেন না?"

"চেঁচাবেন না। চেঁচাচ্ছেন কেন, চেঁচাবার কি আছে! আমি মাতলামি করছি না। আপনি আমার চক্ষে এখন কি জানেন—প্রমাণ চান?"

হঠাৎ সে পুরন্দরবাবুর হাতখানা তুলে নিয়ে চুম্বন করলে। ঘাবড়ে গেলেন পুরন্দরবাবু।

"এই, এই তার প্রমাণ। আর কিছু বলবার নেই, এবার আমি চললাম।"

"যাবেন না, থামুন। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।"

যুগল পালিত দুয়ারের কাছে ফিরে দাঁড়াল।

পুরন্দরবাবু বললেন (তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন যুগলের চোখের দিকে না চাইতে)—"কাল আপনাকে ভবেশবাবুদের ওখানে যেতে হবে। তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ও হবে, তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে আসবেন। ভুলবেন না, যেতেই হবে।"

"নিশ্চয়। যাব বই কি। নিশ্চয়—হ্যাঁ,"—যুগল মাথা এবং হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গী করলে যে পুরন্দরবাবুর মনে তার আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইল না।

"পাপিয়াও অনেক করে' বলে দিয়েছে। আমিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তাকে যে আপনাকে নিশ্চয় নিয়ে যাব।"

"পাপিয়া!"—যুগল পালিত ঘুরে দাঁড়াল ভাল করে'—"পাপিয়া? পাপিয়া আমার কাছে এখন কি এবং কতটা তা জানেন? কোনও ধারণা আছে আপনার" হঠাৎ পাগলের দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চোখে।

"আচ্ছা থাক— সে কথা পরে হবে, পরে হবে। আর একটা কথা শুনুন আগে—একসঙ্গে বসে' মদ খাওয়াতেই সন্তুষ্ট নই আমি," হঠাৎ সে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল এবং নির্নিমেষে চেয়ে রইল।

"আবার কি চাই—"

"আমাকে চুমুও খেতে হবে"

"পাগল না কি! কি বলছেন যা তা—"

"হতে পারে, কিন্তু চুমু খেতেই হবে আপনাকে। খান, আসুন। এখুনি তো আমি আপনার কর-চুম্বন করলাম।"

পুরন্দরবাবু বজ্রাহতবৎ নিষ্পন্দ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। হঠাৎ ঝুঁকে—যুগল পালিতের মাথাটা তাঁর বুকের কাছে পড়েছিল প্রায়—চুম্বন করলেন তাকে। মুখে ভীষণ মদের গন্ধ!

"বাস্ বাস্ বাস্ বাস্"—চীৎকার করে উঠল যুগল, চোখ দুটো জ্বলে' উঠল যেন উন্মত্ত হিংস্রতায়—"বাস্! এইবার সব খুলে বলি শুনুন—আপনাকে সন্দেহ হয়েছিল আমার। এর পর আর কারও ওপর কি বিশ্বাস হয়?"

হঠাৎ কেঁদে ফেললে সে। ঝর ঝর করে' চোখের জল ঝরে' পড়তে লাগল।

"সুতরাং বুঝতে পারছেন, আপনিই এখন আমার একমাত্র বন্ধু।"

ছুটে বেরিয়ে চলে গেল।

পুরন্দরবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"মাতলামি করে' গেল লোকটা"—হাত নেড়ে খানিকক্ষণ পরে বললেন "নাঃ—মাতলামি ছাড়া আর কিছু নয়। স্রেফ মাতলামি।"

পরদিন সকালে পুরন্দরবাবু যুগলের প্রতীক্ষা করছিলেন, তাকে নিয়ে ভবেশবাবুর ওখানে যেতে হবে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি। সিগারেট ধরালেন একটা। একটা কথা কিন্তু কিছুতে ভুলতে পারছিলেন না—মনে হচ্ছিল কাল রাত্রে তাঁর গালে কে যেন চড় মেরে গেছে একটা।

"হুঁ···সব জানে, বুঝতে পেরেছে সমস্ত। পাপিয়ার ওপর দিয়ে শোধটা তুলবে" কথাটা ভেবেই ভয় হল তাঁর। পাপিয়ার সুন্দর মুখখানি ভেসে উঠল মনের উপর—বিষাদ-মাখানো মুখখানি। একটু পরেই আবার তাকে দেখতে পাবেন মনে হবামাত্র হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। পাপিয়া তাঁরই যে।

"না, তর্কের কোন অবসর নেই এতে। পাপিয়া আমারই। ওই এখন আমার জীবন এবং জীবনের লক্ষ্য। অতীতের স্মৃতি নিয়ে কি হবে, গালে চড় মারলেই বা কি এসে যায়। জীবনে কি করলাম এতদিন? জঞ্জাল আর জ্বালা ছাড়া কি বা পেয়েছি। কিন্তু এইবার সব ঠিক হয়ে যাবে, সব বদলে গেছে এর মধ্যেই!"

একটু পুলকিত হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু একটা ছায়া ঘনিয়ে আসতে লাগল ক্রমাগত। "বেশ বুঝতে পারছি পাপিয়াকে দিয়েই ও জব্দ করতে চায় আমাকে। পাপিয়াকে কষ্ট দিচ্ছে সেই জন্যে। এই ভাবেই প্রতিশোধ নেবে! হুঁ···। না, কাল যা করেছে তা আর করতে দিচ্ছি না অবশ্য"—মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল তাঁর—"বারোটা বাজে—এখনও পর্য্যন্ত পাত্তা নেই তার—ব্যাপার কি!"

প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সাড়ে বারোটা বাজল। অধীর হয়ে উঠলেন শেষে। এল না। হঠাৎ একটা কথা মনে হল—অনেকক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছিল—যুগল হয়তো ইচ্ছে করে' আসছে না। পরে এসে কাল রাত্রের মতো আবার একটা নাটক করবে হয় তো। রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠল তাঁর। "সে ভাল করেই জানে যে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছি—এও জানে পাপিয়া তার আশা পথ চেয়ে আছে। তাকে সঙ্গে না নিয়ে যাবই বা কি করে' আমি···আঃ।"

আর অপেক্ষা করতে পারলেন না, একটা বাজতেই যুগলের বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে গিয়ে শুনলেন যুগল কাল রাত্রে বাড়ি ফেরেনি, সকালে ন'টার সময় এসেছিল, পনর মিনিট থেকেই আবার বেরিয়ে গেছে। পুরন্দরবাবু বন্ধ দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে চাকরের কথাগুলো শুনলেন, তার পর তালাটা ধরে' অকারণে টানলেন দু' একবার অন্যমনস্ক-ভাবে। তার পর সহসা সচেতন হয়ে লজ্জিত হলেন একটু। বাড়ির মালিক তে'তলায় থাকেন। চাকরটাকে বললেন তাঁকে একবার ডেকে দিতে।

বাড়ির মালিক লোকটি ভালই। ভদ্রলোক। পাপিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর সব শুনে বললেন, "পাপিয়ার জন্যেই আমি এতদিন কিছু বলিনি মশাই। তা নাহলে এতদিন ওরকম লোককে দূর করে' দিতাম। উনি প্রথমে একটা হোটেলে এসে উঠেছিলেন—ওঁর রকম সকম দেখে হোটেলওয়ালা দূর করে' দিলে। কি বলব মশাই—অত বড় মেয়ে সঙ্গে রয়েছে—একদিন এক মাগী এনে হাজির! চীৎকার করে বলছে আবার—"আমি যদি ইচ্ছে করি—এই তোর মা হতে পারে"—আর সে মাগী কি বললে শুনবেন? বললে—'ঝাঁটা মারি আমি অমন মেয়ের মুখে। মেয়ের বাপের মুখেও'···সে যে কি কাণ্ড মশাই—"

"সত্যি?" পুরন্দরবাবু সত্যিই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

"আমি স্বকর্ণে শুনেছি। লোকটা মাতাল অবশ্য খুবই হয়েছিল—জ্ঞানগম্যি কিছুই ছিল না, কিন্তু নিজের মেয়ের সামনে ও রকম বেলেল্লাপনা করাটা উচিত কি, মেয়েটা ভাববে কি, নিতান্ত ছেলেমানুষ তো নয়। মেয়েটা খালি কাঁদত, কি আর করবে। আর ও ইচ্ছে করে' কাঁদাত মেয়েটাকে। সেদিন আবার এক কাণ্ড হয়েছিল সামনের বাড়িতে। এক কেরাণী গলায় দড়ি দিয়েছিল। দলে দলে লোক দেখতে গেল। চারদিকে ভীড়। যুগলবাবু বাড়ি ছিলেন না, মেয়েটা ভীড়ে মিশে চলে গেছে সেখানে, দেখলাম মড়াটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে। কি দৃষ্টি চোখের! আমি তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে এলাম। ভয়ে ঠক ঠক করে' কাঁপছিল, শাদা মূর্ত্তি—এসেই শুয়ে পড়ল—দেখি মূর্চ্ছা গেছে। মুখে জলের ঝাপটা দিতে জ্ঞান হল। তারপর থেকেই মেয়েটা কেমন যেন হয়ে গেছে। যুগলবাবু বাড়ি এলেন—এসে মেয়েটাকে খামচাতে লাগলেন। ও মারে না কখনও—কেবল খামচায়। তারপর থেকে মদ খেয়ে যখনই বাড়ি ফেরে মেয়েটাকে ভয় দেখায় কেবল—আমিও গলায় দড়ি দেব। তোর জ্বালাতেই গলায় দড়ি দিতে হবে আমাকে। এই দেখ দড়ি এনেছি। সত্যি সত্যি একটা দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে দেখায়—আর মেয়েটা ভয়ে চেঁচাতে থাকে—দুহাত দিয়ে বাপের গলা জড়িয়ে কেবলই বলতে থাকে 'কিচ্ছু করব না, তুমি যা বলবে শুনব, গলায় দড়ি দিও না বাবা।' অত্যন্ত করুণ দৃশ্য মশাই। যাচ্ছেতাই—"

যদিও পুরন্দরবাবু এমনই কিছু একটা প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু যা শুনলেন তা এতই বীভৎস যে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না তার।

বাড়ি-ওলা আরও অনেক কিছু বললেন। বললেন—পাপিয়া দোতলার জানলা থেকে ঠিক লাফিয়ে পড়ত একদিন তিনি যদি না থাকতেন সে সময়।

পুরন্দরবাবু দোতলা থেকে নেবে গেলেন—পা টলছিল তার।

"ব্যাটাচ্ছেলেকে ধরে' চাবকাব আমি"...এই কথাটাই মনে হচ্ছিল কেবল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই একটা কথাই বারম্বার আবৃত্তি করতে লাগলেন তিনি মনে মনে।

তাঁকে একলাই যেতে হল শেষ পর্য্যন্ত ভবেশবাবুর ওখানে। কিছুদূর গিয়ে গাড়িটা একটা চৌমাথায় দাঁড়াল, সারি সারি অনেক গাড়ি দাঁড়িয়েছে, শোভাযাত্রা চলেছে একটা। প্রচুর ভীড়। হঠাৎ পুরন্দরবাবুর চোখে পড়ল একটা গাড়িতে যুগল রয়েছে! গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে হাসলে একটু। বেশ স্ফূর্ত্তিতে আছে মনে হ'ল—তাঁকে ইসারা করে' ডাকতেও লাগল। পুরন্দরবাবু গাড়ী থেকে নেমে ভীড় ঠেলে, পুলিশ ঠেলে, প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে তার গাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হলেন এবং চীৎকার করে বললেন "কি ব্যাপার কি? আপনি এলেন না যে! এখানে কি করছেন?"

"ঋণ শোধ করছি। চেঁচাবেন না অত, ঋণ শোধ করছি মশাই" চোখ মট্‌কে মুচকি হেসে বলল—"বন্ধুবর পূর্ণ গাঙ্গুলীর শবানুগমন করছি—ঋণ—ঋণ শোধ।"

ভয়ানক রাগ হল পুরন্দরবাবুর।

"আঃ—কি যা তা বলছেন! আবার মদ খেয়েছেন না কি? আসুন, নাবুন গাড়ি থেকে, আসুন আমার সঙ্গে।"

"ক্ষমা করবেন, পারব না। মহৎ কর্ত্তব্য এটা—"

"জোর করে টেনে নাবিয়ে নেব"

"আমি চেঁচাব তাহলে, ঠিক চেঁচাব"—গাড়ির ওদিককার কোণে সরে' গেল। যেন ভারি একটা মজার রসিকতা হচ্ছে। পুরন্দরবাবু মনে মনে গাল দিতে দিতে নিজের গাড়িতে ফিরে গেলেন।

"যাক্‌গে। ওরকম লোককে নিয়ে যাওয়াও যায় না ভদ্র পরিবারে" এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু মনটা বিরক্তই হয়ে রইল।

নীলিমাকে গিয়ে সব বললেন। বাড়ী-ওলার কাছ থেকে যা যা শুনেছিলেন, সব, তাছাড়া শবানুগমনের কথাও। শুনে তিনি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

"আপনার জন্যে ভয় হচ্ছে আমার। ওর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবেন না।"

"ও কি করবে আমার! একটা হতভাগা মাতাল বই তো নয়"—পুরন্দরবাবু যেন চটেই গেলেন কথাটা শুনে, একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে' উঠলেন—"আমি কি ভয় পেয়েছি ভাবলে না কি? তাছাড়া সম্পর্ক তো রাখতেই হবে এখন পাপিয়ার জন্যে, পাপিয়ার কথাটা ভেবে দেখ।"

পাপিয়ার এদিকে অসুখ করেছিল। কাল থেকেই জ্বর হয়েছে। কোলকাতা থেকে একজন বড় ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, যে কোন মুহূর্তে তিনি এসে পড়তে পারেন।

ষোল-কলা পূর্ণ হ'ল যেন। পুরন্দরবাবু অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন।

নীলিমা তাঁকে পাপিয়ার কাছে নিয়ে গেলেন।

'কাল সমস্তক্ষণ ওর কাছেই ছিলাম"—ঘরের বাইরে একটু থেমে নীলিমা বললেন—"মেয়েটা খুব চাপা স্বভাবের, আত্মসম্মানও খুব। এখানে আছে সেজন্যে যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। ওর বাবা যে ওকে এমন ভাবে ত্যাগ করেছে এইটে ওর প্রাণে বড্ড লেগেছে। আমার মনে হয় এই ওর অসুখের আসল কারণ।"

"ত্যাগ করেছে মানে? ত্যাগ করেছে বলছ কেন?"

"সম্পূর্ণ অচেনা বাড়িতে এমন ভাবে পাঠিয়ে দেওয়া মানেই তো—বিশেষত এমন লোকের সঙ্গে যে···যে লোকটাও সম্পূর্ণ অচেনা।"

"কি বিপদ, আমি তো ওকে জোর করে' নিয়ে এসেছি—আমি তো এতে কোন—কিন্তু পাপিয়া কি তাই মনে করেছে—ওইটুকু মেয়ে এতটা

বোঝে ?—এতটা বোঝবার ক্ষমতা আছে ওর ! যুগল আসবে না এখানে, কি করব বল !"

পুরন্দরবাবুকে একা দেখে পাপিয়া বিস্মিত হ'ল না, একটু ম্লান হাসি হেসে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুল সে। পুরন্দরবাবু অপটুভাবে একটু আদর করবার চেষ্টা করলেন, ভয়ে ভয়ে গায়ে মাথায় হাত দিলেন —পাপিয়া নিস্পন্দ হয়ে রইল। একবার ফিরে চাইল না পর্য্যন্ত। বাইরে বেরিয়ে এসে পুরন্দরবাবু কেঁদে ফেললেন হঠাৎ।

সন্ধ্যার সময় ডাক্তারবাবু এলেন এবং সব দেখে শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন আমাকে আগেই খবর দেওয়া উচিত ছিল। মাত্র কাল থেকে জর হয়েছে একথা বিশ্বাসই করতে চাইলেন না তিনি প্রথমে।

"আজ রাতটা কি ভাবে কাটে তারই উপর নির্ভর করছে সব—" অবশেষে এই সিদ্ধান্তে এসে অনেক রকম 'ইনষ্ট্রাক্শনস্' (ব্যবস্থা) দিয়ে বলে গেলেন যে কাল আবার আসবেন সকালেই। গতিক ভাল মনে হচ্ছে না তাঁর।

পুরন্দরবাবু রাতটা থাকতেন কিন্তু নীলিমা দেবী বললেন, "ওর বাপকে আর একবার আনবার চেষ্টা করুন। একথা শুনেও আসবেন না এমন পাষণ্ড কি হতে পারে মানুষ !"

'চেষ্টা !"—পুরন্দরবাবু হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন যেন—"হাত পা বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসব তাকে, যদি না আসতে চায় এবার !" যুগল পালিতকে হাত-পা বেঁধে নিয়ে আসবার দৃশ্যটা ফুটে উঠল তাঁর মনে—হঠাৎ রাগ চড়ে গেল। হাত-পা বেঁধেই আনতে হবে, যা থাকে কপালে।

"কাল আমার দুঃখ হচ্ছিল—ভাবছিলাম অন্যায় করেছি লোকটার প্রতি। এখন কিছু দুঃখ হচ্ছে না—মানুষ নয়, একটা পশু !—"

ফেরবার ঠিক আগে নীলিমাকে এই কথাগুলি বলে পাপিয়ার ঘরে আবার ঢুকলেন তিনি।

পাপিয়া চোখ বুজে চুপ করে' শুয়েছিল, যেন ঘুমুচ্ছে। মনে হল একটু

ভাল আছে। পুরন্দরবাবু একটু ঝুঁকে আস্তে আস্তে মাথার উপর হাত রাখলেন, চুমু খাবার চেষ্টা করলেন একবার—পাপিয়া ফিরে তাকাল হঠাৎ, যেন সে তাঁরই অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ।

"আমাকে নিয়ে চলুন এখান থেকে।"

অতিশয় করুণ সুরে সে বললে কথা ক'টি, শান্ত মৃদু মিনতিভরা সুরে। পুরন্দরবাবু যে তার অনুরোধ রাখবেন না এও যেন সে বুঝতে পেরেছিল—তার বলবার ভঙ্গী থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তা। পুরন্দরবাবু অনেক করে' বোঝাতে লাগলেন তাকে।

নীরবে চোখ দু'টি বুজে সে পাশ ফিরে শুল, একটি কথাও আর বললে না। পুরন্দরবাবুর কোন কথা সে যে শুনতে পাচ্ছে তা মনে হল না।

কোলকাতায় পৌঁছে পুরন্দরবাবু সোজা যুগলের বাসায় গেলেন। তখন রাত্রি দশটা; যুগল তখনও বাড়ি ফেরে নি। পুরন্দরবাবু পুরো আধঘণ্টা তার জন্যে অপেক্ষা করলেন, অধীর চিত্তে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন তার বাসার বারান্দায়। বাড়ি-ওলা বললেন, ভোরের আগে সে ফিরবে না, কেন বৃথা অপেক্ষা করছেন।

"বেশ ভোরেই আসব তাহলে"—পুরন্দরবাবু আর বেশী কিছু না বলে' বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর সমস্ত শরীরের রক্ত টগবগ করে' ফুটছিল যেন।

বাড়ি ফিরে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর চাকর বললে "কাল যে বাবু এসেছিলেন তিনি আজও এসেছেন আবার। অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন। তাঁকে চা করে' দিলাম। আজও মদ আনবার জন্যে টাকা দিলেন। এনে দিয়েছি এক বোতল।"

৯

যুগল পালিত বেশ জুৎ করে' বসেছিল। আগের দিন যে চেয়ারটায় বসেছিল সেই চেয়ারেই বসে' মহানন্দে মদ খাচ্ছিল সে—হাতে জলন্ত সিগারেট। তৃতীয় গ্লাস শেষ করে' চতুর্থ গ্লাস স্বরু করেছিল। টি-পটটা আর আধকাপ চা পড়েছিল টেবিলের একধারে। গায়ের কোট খুলে বেশ বাগিয়ে বসেছিল যুগল। সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত।

"আসুন, আসুন, আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি"—পুরন্দরবাবুকে দেখেই বলে উঠল সে—"গরম লাগছিল কোটটা খুলে ফেলেছি, আশা করি আপত্তি নেই আপনার তাতে।"

পুরন্দরবাবুর মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠল।

"বোতলে আর কতটা আছে? ভদ্রভাবে আলাপ করবার মতো অবস্থা আছে কি আপনার এখন?"

যুগল একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

"না ঠিক নেই। মৃত বন্ধুর স্মৃতিতর্পণ করছি, তবে ঠিক—"

"আমার কথা শুনবেন?"

"সেই জন্যেই তো এসেছি।"

"তাহলে শুনুন—প্রথমেই বলছি আপনি অতি অপদার্থ লোক, বুঝলেন?"

"আপনি যদি এই ভাবে স্বরু করেন কি ভাবে শেষ করবেন তাতো বুঝতে পাচ্ছি না। বাবা।"

যুগল ব্যাপারটাকে যদিও লঘু পরিহাস ভরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু মনে মনে একটু ভীত হয়ে পড়ল সে।

আপনার মেয়ে মরছে, ভয়ানক অসুখ তার, আপনি কি তাকে ত্যাগ করেছেন না কি ?"

"সত্যি মরছে ?"

"অসুখ, অসুখ—ভয়ানক অসুস্থ সে···"

"ফিট টিট ?"

"ভাঁড়ামি করবেন না। ভ—য়া—ন—ক অসুখ, হয়তো বাঁচবে না। আপনি গেলেন না কেন ? যাওয়া উচিত ছিল না আপনার ?"

"কেন. তাঁরা আমার মেয়েকে দয়া করে স্থান দিয়েছেন বলে' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যে! উচিত ছিল। পুরন্দরবাবু, দরদী বন্ধু আমার"—হঠাৎ সে পুরন্দরবাবুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরলে নিজের হাতের মধ্যে—"রাগ কোরো না দাদা, রাগ করে' কষ্ট পেও না। আমি যদি মরে যাই, কিম্বা মদের ঝোঁকে গঙ্গায় লাফিয়ে পড়ি দুনিয়ার কি এসে যায় তাতে—কিসসু না। ভবেশবাবুর বাড়ি যাওয়ার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে ···যথেষ্ট—সময়ের অভাব কি !"

যুগলের অবস্থা দেখে আত্মসম্বরণ করলেন পুরন্দরবাবু।

"আপনি মদের ঝোঁকে কি বলছেন যা তা! আপনার সঙ্গে একটা দরকারি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই—আপনি যদি এরকম করেন তাহলে কি করে' হবে তা' ? এ রকম করলে কিন্তু ভয়ানক রাগ করব বলে' দিচ্ছি—শুনুন, আজ রাত্রে থাকুন আপনি এখানে। সকালে দু'জনে যাওয়া যাবে এক সঙ্গে। সোজায় যদি না যান বেঁধে নিয়ে যাব, বুঝলেন ! বেঁধে নিয়ে যাব! ওই সোফাটায় শুতে আপনার কষ্ট হবে কি—"

যে সোফাটায় তিনি নিজে শুতেন সেইটে দেখিয়ে বললেন "ওটাতে চলবে আপনার ?"

"খুব চলবে। যেখানে হোক শুলেই হ'ল।"

"এই নিন চাদর, তোষক বালিশ" পাশের ঘর থেকে পুরন্দরবাবু নিজেই

বয়ে আনলেন সব এবং যুগলের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন—"বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন। এখুনি শুয়ে পড়ুন।"

বিছানার বোঝা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে' ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যুগল ইতস্তত করতে লাগল। মুখে মাতালের হাসি। পুরন্দরবাবু আর একবার ধমক দিতেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে টেবিলটা সরিয়ে ভয়ে ভয়ে বিছানা পাততে লাগল সে। পুরন্দরবাবুও সাহায্য করতে লাগলেন। লোকটার উপর আর রাগ হচ্ছিল না, তার ভীত ত্রস্তভাব দেখে করুণাই হচ্ছিল বরং।

"গ্লাসে যে মদটুকু ঢেলেছেন, খেয়ে ফেলুন সেটা। খেয়ে শুয়ে পড়ুন—আদেশের ভঙ্গীতে বললেন পুরন্দরবাবু।

"মদ আপনিই আনতে দিয়েছিলেন, না?"

"হাঁ...আপনি যে আর আনিয়ে দেবেন না তা বুঝেছিলাম আগেই—"

"বুঝে ভালই করেছিলেন। আর একটা কথাও শুনুন, আপনার কোনরকম মাতলামি আর সহ্য করব না আমি। কালকের মতো যে বলবেন—চুমু খাব—সে সব আর চলবে না, বুঝলেন?"

"বুঝেছি, ওসব কি আর বারবার হয়"—হঠাৎ ফিক করে' হেসে ফেললে' সে। হাসিটা পুরন্দরবাবু দেখতে পেলেন না। তিনি ঘরের চতুর্দিকে পরিক্রমণ স্থরু করেছিলেন। উত্তরটা শুনে হঠাৎ থেমে গেলেন এবং যুগলের সামনে এসে গম্ভীরভাবে বললেন—"সরলভাবে ব্যাপারটা খুলে বলুন না সব। আপনাকে তো চিনি আমি—লোক তো আপনি খারাপ নন—ভুলপথে চলছেন কেন এ ভাবে? সরলভাবে সমস্ত কথা অকপটে খুলে বলুন; আমি কথা দিচ্ছি, আমাকে যা জিগ্যেস করবেন আমিও অকপটে তার উত্তর দেব।"

যুগল নীরবে সমস্ত দন্তগুলি বিকশিত করে' তাঁর দিকে চেয়ে রইল। পুরন্দরবাবুর মাথার শিরগুলো দপ দপ করে' উঠল আবার।

"ও কি!—চীৎকার করে' উঠলেন তিনি প্রায়—"ওরকম করে'

চেয়ে আছেন কেন! কি দরকার এ রকম লুকোচুরির? আমি কিছু বুঝতে পারছি না ভাবছেন? শুনুন, খুলে বলুন সব। আমি কথা দিচ্ছি—ওয়ার্ড অব অনার—আপনি যা জিগ্যেস করবেন আপনার প্রতিটি প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাবেন আমার কাছে। অসঙ্গত আজগুবি—যা খুশী জিগ্যেস করুন—যা খুশী। আমার যে কি হচ্ছে তা যদি বুঝতেন তাহলে এ রকম করতেন না কক্‌খনো। কি জানতে চান বলুন?"

যুগল পালিত ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তার দিকে।

"এতই যখন প্রসন্ন হচ্ছেন তাহলে একটা কথার জবাব দিন দিকি। কাল রাত্রে যে বললেন—নিরীহ স্বামী—তার অর্থটা কি?"

পুরন্দরবাবু আবার পরিক্রমণ সুরু করলেন।

"রাগ করলেন? রাগ করবেন না। ওই কথাটার মানে জানবার ভারী কৌতূহল হচ্ছে—অত্যন্ত। সত্যিকথা বলতে কি—ওইটে জানবার জন্যেই বিশেষ করে' আমি আজ...দেখুন সব কথা গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা আমার নেই। বেফাঁস যদি কিছু বলে বসি মাপ করবেন। জুলুমবাজ মানেই বা কি! পূর্ণ গাঙ্গুলী কোন টাইপ?

জুলুমবাজ স্বামী পূর্ণ গাঙ্গুলীর খাবারে বিষ মেশাত কিম্বা তার বুকে ছুরি বসাত—তার শবানুগমন করত না, আপনি যেমন করলেন আজ। আচ্ছা ওই মড়াটার পিছু পিছু গেলেন কেন! কোন মতলব ছিল না কি? ছি, ছি, এ কি জঘন্য প্রবৃত্তি আপনার—

ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বলে ফেললেন পুরন্দরবাবু।

"হ্যাঁ, যাওয়াটা উচিত হয় নি, তা ঠিক। কিন্তু আপনি বড় বেশী চটেছেন দেখছি—"

"এমন করে' বেড়ানো কি পুরুষমানুষের সাজে? নিজের দুঃখের কাহিনী বিনিয়ে বিনিয়ে চারদিকে বলে' বেড়ানো, একই কথা ভ্যান্‌ভ্যান করে' বারবার বলা আর তাই নিয়ে লোকের গায়ে পড়ে' নানা রকম চা

করা—এসব কি ব্যাটাছেলের কাজ? আপনি গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিলেন না কি?"

"মদ খেলে অনেক রকম করে থাকি—কি করেছিলুম মনে নেই। আচ্ছা, কারও খাবারে বিষ মেশানোটা কি ঠিক? ছুরি মারাটাও কি খুব পৌরুষের লক্ষন? কি জানি! দেখুন পুরন্দরবাবু, একটা কথা আপনার মনে রাখা উচিত। আমি মোটা মাইনের চাকরি করি, বিষয় আশয়ও আছে কিছু, বিয়েও করতে পারি আমি আবার।"

"তার চেয়ে চুলোয় যাওয়া ভাল নয়?"

"তা-ও বটে। একটা গল্প শুনবেন? আজ গাড়িতে যেতে যেতে গল্পটা মনে পড়ল, তখনি আপনাকে বলব ভেবেছিলাম। আপনি এখুনি লোকের গায়ে পড়ার কথা বলছিলেন না?—অশোক সেনকে মনে আছে আপনার? আপনি যখন বর্দ্ধমানে ছিলেন তখন সেও আসতো আমাদের বাড়ীতে প্রায়। তার এক ছোট ভাই ছিল—সে ছোকরাও খুব চালিয়াৎ—সেও গভর্ণমেণ্টের চাকরি করত। হঠাৎ সে এক বড় অফিসারের সঙ্গে ঝগড়া করে' বসল। বড় অফিসারটি বেশ জাঁদরেল গোছের ব্যাচিলার ছিলেন। তিনি কি করলেন জানেন?—তিনি একদিন এক সভায় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকদের সামনে অশোককে অপমান করে' বসলেন, সেখানে অশোকের হবু-স্ত্রী সবিতাও ছিল। শুধু তাই করেই ক্ষান্ত হলেন না; সবিতার বাপের কাছে গিয়ে সবিতাকে বিয়ে করতে চাইলেন—এবং যেহেতু তিনি অশোকের চেয়ে ঢের উঁচুদরের অফিসার, সবিতার বাপ মা এমন কি সবিতা নিজে পর্য্যন্ত অশোককে ত্যাগ করে' তাঁকে বরণ করতে রাজী হয়ে গেলেন। অথচ আমরা শুনেছিলাম সবিতা না কি প্রেমে পড়েছে অশোকের! আর অশোক কি করলে জানেন? সে সেই বিয়েতে বরযাত্রী গেল, তারপর, মানে বিয়ের পর একদিন খুন চেপে গেল তার—অফিসারটার পেটে ছুরি বসিয়ে দিলে সে

হঠাৎ। বসিয়ে দিয়েই কিন্তু হাহাকার করে উঠল—আঃ এ কি করলাম। কেঁদেই ফেললে। লোকের এমন কি স্ত্রীলোকেরও গায়ে পড়ে' বলে বেড়াতে লাগল ক্রমাগত—ছি ছি একি করে ফেললাম। হি—হি—হি—খুব দেখালে একচোট অশোক। অফিসারটী অবশ্য মরল না, বেঁচে গেল শেষ পর্যান্ত, ছুরিটা ভাল করে' ঢোকেনি!"

"আমাকে এ গল্প বলার অর্থ তো বুঝতে পারছি না" পুরন্দরবাবু ভ্রূ-কুঞ্চিত করে' বললেন।

"আপনার কথাতেই মনে পড়ল গল্পটা। আপনার টাইপের সঙ্গে ঠিক মিলল কি? এ লোকটা ছুরিও মারলে, আর ঢং করে' লোকের গায়ে পড়ে' পড়ে' হাহাকারও করে' বেড়াল। শেষটা ভুলেছিল কিন্তু ঠিক—অ্যাঁ, কি বলেন আপনি!"

"আকার-ইঙ্গিতে আপনি কি বলতে চান?" ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল পুরন্দরবাবুর। চীৎকার করে' উঠলেন তিনি—"আপনি কি ভেবেছেন আমি ভয় পেয়ে যাব? একটা শিশুকে যন্ত্রণা দিচ্ছেন আমাকে ভয় খাওয়াবার জন্যে, পাজি নচ্ছার হারামজাদা কোথাকার—"

"কি বললেন?"

"হারামজাদা হারামজাদা, হারামজাদা—"

যুগলের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল।

"আপনি, আপনি পুরন্দরবাবু—হারামজাদা বলছেন আমাকে!"

পুরন্দরবাবু আত্মস্থ হলেন। বুঝলেন যে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

"মাপ করুন আমাকে, রাগ সামলাতে পারি নি। আপনি এমন বাঁকা চোরা পথে চলেছেন কেন! যা বলবেন, বলুন না সোজাসুজি—"

"ক্ষমা চাইলেন তাহলে—"

"হ্যাঁ নিশ্চয়, শুধু এর জন্য নয় সমস্তর জন্য ক্ষমা চাইছি। সব চুকে বুকে যাক।"

"ও—মানে—"

"আর মানে টানে নয়, মদটুকু শেষ করে' শুয়ে পড়ুন এবার।"

"ও মদটুকু..." যুগল ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল, তারপর চোঁ চোঁ করে' খেয়ে ফেলল মদটা। খানিকটা জামায় পড়ে গেল। হাত কাঁপছিল তার। সসম্ভ্রমে গ্লাসটা টেবিলের উপর রেখে শুতে গেল সে। কামিজটা খুলে ফেলল। তারপর একটা জুতো খুলে হঠাৎ সে বললে—"এখানে রাতটা কাটানো কি ভাল হচ্ছে?"

পুরন্দরবাবু আবার পরিক্রমণ স্থরু করেছিলেন, ঘাড় না ফিরিয়েই তিনি উত্তর দিলেন—"খুব ভাল হচ্ছে।"

যুগল শুয়ে পড়ল। মিনিট পনের পরে পুরন্দরবাবুও আলো নিবিয়ে শুলেন। একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। অপ্রত্যাশিতভাবে নূতন যে কাণ্ডটা ঘটল তাতে সমস্ত ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে পড়ল তো, মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। নিজের অক্ষমতা যেন প্রকট হয়ে পড়ছিল নিজের কাছেই। একটা খস খস শব্দ শুনে হঠাৎ তন্দ্রাটা ভেঙে গেল তাঁর। ঘাড় ফিরিয়ে যুগলের বিছানার দিকে চেয়ে দেখলেন। অন্ধকার ঘর, তবু কিন্তু পুরন্দরবাবুর মনে হল যুগল বিছানায় উঠে বসেছে।

"কি হ'ল"—পুরন্দরবাবু জিগ্যেস করলেন।

"ভূত"—চুপি চুপি যুগল বললে।

"ভূত! কোথা?"

'ওই যে পাশের ঘরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাচ্ছি।"

"কার ভূত?"

"অপর্ণার।"

পুরন্দরবাবু উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি। পাশের ঘরের দরজাটা খোলা ছিল, চেয়ে দেখলেন সেদিকে কিছুই চোখে পড়ল না তাঁর।

"কই, কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো! ভূত নয়, হুইস্কি—শুয়ে পড়ুন আপনি।"

পুরন্দরবাবু শুয়ে আপদ মস্তক চাদর দিয়ে ঢাকা দিলেন।

যুগলও শুয়ে পড়ল, আর কোন উচ্চবাচ্য না করে'।

"ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ভূত দেখেছেন আপনি?" মিনিট দশেক পরে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

"একবার দেখেছি বোধ হয়" ক্ষীণকণ্ঠে যুগল উত্তর দিল।

নীরবতা ঘনিয়ে এল আবার।

পুরন্দরবাবু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কি না কে জানে, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ আবার পাশ ফিরলেন তিনি…কোন খস খস শব্দ শুনেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল না কি? নির্ণয় করতে পারলেন না ঠিক—কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলেন তাঁর বিছানার কাছে ঘরের মাঝখানে শাদা কি একটা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিছানায় উঠে বসে পুরো একটি মিনিট চেয়ে রইলেন তিনি সেদিকে।

"যুগলবাবু না কি"—স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

অন্ধকারে নিজের কণ্ঠস্বরই অদ্ভুত শোনাল। কোন উত্তর নেই। কিন্তু কেউ যে একজন দাঁড়িয়ে আছে তাতেও সন্দেহ নেই কোন।

"কে—যুগলবাবু না কি"—আর একবার, আর একটু জোরে জিগ্যেস করলেন। এত জোরে যে যুগল ঘুমিয়ে থাকলেও জেগে উঠে সাড়া দেওয়া উচিত ছিল তার। কিন্তু এবারও কোন উত্তর এল না, কিন্তু মনে হল সাদা অস্পষ্ট মূর্ত্তিটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। এর পরই যা হল তা অদ্ভুত, পুরন্দরবাবুর মাথার মধ্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন—উন্মাদের মতো ভীষণ তারস্বরে চীৎকার করে উঠলেন তিনি সমস্ত শালীনতা বিস্মৃত হয়ে—

"ব্যাটাচ্ছেলে মাতাল আমাকে ভয় দেখাবে ভেবেছ। আমি দেওয়ালের

দিকে মুখ ফিরিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে সমস্ত রাত শুয়ে থাকব—একবারও ফিরব না তোমার দিকে···দাঁড়িয়ে থাক সমস্ত রাত···থোড়াই কেয়ার করি আমি···ব্যাটা মাতাল কোথাকার—থুঃ—থুঃ—থুঃ—"

উন্মাদের মতো থুতু ফেলতে লাগলেন তার দিকে। তারপর বিছানায় শুয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়ে অনড় হয়ে রইলেন। আবার নীরবতা ঘনিয়ে এল চারদিকে। মূর্তিটা এগিয়ে আসছে, না এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তা বুঝতে পারছিলেন না, যদিও কিন্তু বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছিল। পুরো পাঁচটি মিনিট কেটে গেল। তারপর বিছানার ঠিক পাশেই শোনা গেল যুগলের বিনীত মিনতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর—"আমি দেশলাইটা খোঁজবার জন্যে উঠেছি। টেবিলে নেই, ভাবলাম আপনার বিছানার তলায় যদি থাকে।"

"আমি যে এত চেঁচালাম আপনি একটি কথা বললেন না—এর মানে কি" একটু পরে প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

"আপনি এত জোরে চীৎকার করে' উঠলেন যে, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

"আপনার বিছানার পাশেই কুলুঙ্গিতে দেশলাই আছে। আলো জ্বালবেন?

"না, সিগারেট ধরাব একটা। আলোর দরকার নেই। ছি, ছি, আপনার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলুম। সরি—"

কুলুঙ্গিটার দিকে ধীরে ধীরে সরে' গেল সে।

পুরন্দরবাবুও আর কথা কইলেন না। তখনও দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিলেন তিনি এবং সমস্ত রাত তেমনি ভাবেই শুয়ে রইলেন। যুগলকে বলেছিলেন বলেই যে শুয়ে রইলেন, না অন্য কোন কারণ ছিল, তা নিজেও বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর মানসিক অবস্থা এমন হয়েছিল যে, যেন বিকারের ঘোরে আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইলেন, কখন যে ঘুমিয়ে

পড়লেন তা জানতেও পারলেন না। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন ন'টা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন বিছানায়, যেন কে ঠেলে তুলে দিলে তাঁকে। উঠে দেখলেন যুগল পালিত নেই—খালি বিছানা পড়ে আছে। "এ আমি আগেই জানতাম"—বলে' কপালে হাত দিয়ে বসে রইলেন তিনি।

১০

ডাক্তারবাবু যা ভয় করছিলেন তাই হল শেষকালে। পাপিয়ার অবস্থা দেখতে দেখতে খারাপ হয়ে গেল, হঠাৎ এমনটা যে হবে তা নীলিমা দেবী বা পুরন্দরবাবু একটুও বুঝতে পারেন নি আগের দিন। পুরন্দরবাবু সকালে এসে দেখলেন জ্ঞান আছে, এমন কি তাঁকে দেখে সে যেন হাত দুটি তাঁর দিকে বাড়িয়েও দিলে তাঁর মনে হ'ল। সত্যি বাড়িয়ে দিয়েছিল, না নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে পুরন্দরবাবু অজ্ঞাতসারে এটা কল্পনা করেছিলেন তা অবশ্য নিজেও তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না পরে। সন্ধ্যার দিকে ক্রমশ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। শেষ পর্য্যন্ত অজ্ঞানই ছিল। ভবেশবাবুর বাড়িতে আসবার ঠিক দশদিন পরে মারা গেল সে।

পুরন্দরবাবু এত বিচলিত হয়ে পড়লেন যে তাঁর জন্যে ভবেশবাবুদের চিন্তা হল। পাপিয়ার শেষ সময়টা তিনি তাদের বাড়িতেই ছিলেন দিনরাত। ঘরের কোণে চুপ করে' বসে থাকতেন অসাড় হয়ে। কারও সঙ্গে কথা কইতে প্রবৃত্তি হত না, নীলিমা দেবী নানা কথা পেড়ে তাঁর মনটা অন্যদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু কোন ফল হত না, কোনও উত্তরই দিতেন না তিনি। পাপিয়ার জন্যে যে পুরন্দরবাবু এতটা ভেঙে পড়বেন তা ভাবতেই পারে নি কেউ। বাড়ির ছেলেমেয়েরা এসে নানাভাবে ভোলাতে চেষ্টা করত, তাদের সঙ্গেই যা' দু'একবার হেসে কথা কইতেন তিনি। কিন্তু প্রায়ই পা টিপে টিপে উঠে যেতেন পাপিয়ার বিছানার পাশে। চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকতেন। মাঝে-মাঝে মনে হত পাপিয়া যেন চিনতে পারছে তাঁকে। পাপিয়া যে বাঁচবে এ আশা তিনি করেন নি, কেউ করে নি।

কিন্তু পাপিয়াকে ফেলে রেখে কিছুতেই চলে যেতে পারতেন না। পাশের ঘরটায় বসে থাকতেন চুপ করে'।

হঠাৎ একদিন কোলকাতায় চলে গেলেন। সমস্ত বড় বড় ডাক্তারদের ডেকে নিয়ে এলেন। ডাক্তারদের আলোচনা সভা বসল। পুরন্দরবাবু পাগলের মতো রোজ আসতে অনুরোধ করতে লাগলেন সবাইকে। আর একবার এবং সেই শেষবার এসেছিলেন তাঁরা, পাপিয়ার মৃত্যুর আগের দিন। নীলিমা দেবী বললেন—ওর বাবাকে একবার খবর দেওয়া দরকার। কারণ, যদি কিছু হয়—শ্মশানে নিয়ে যাওয়া যাবে না তিনি না এলে। পুরন্দরবাবু আমতা আমতা করে' বললেন—"আচ্ছা, চিঠি লিখছি একটা। কিন্তু চিঠি লিখলে কি আসবে?" ভবেশবাবু এ কথা শুনে বললেন "বলেন তো পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে আনাবার ব্যবস্থা করি, অনায়াসেই করা যায় তা। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।" পুরন্দরবাবু চিঠিই লিখলেন শেষে একটা এবং সেটা নিয়ে নিজে চলে গেলেন তার বাসায়। যুগল বাসায় ছিল না, থাকবে না তা অনুমানই করেছিলেন—পুরন্দরবাবু চিঠিখানা রেখে এলেন বাড়িওলার কাছে। তিনি স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো কর্তব্য করে যাচ্ছিলেন যেন।

অবশেষে পাপিয়া মারা গেল। সন্ধ্যাবেলা স্বপ্ন ভঙ্গ হচ্ছিল তখন। একটা রূঢ় আঘাতে তাঁর আচ্ছন্নভাবটা চুরমার হয়ে গেল—হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন তিনি। নীলিমা দেবী সুন্দর একটি শাড়ি পরিয়ে ফুল দিয়ে চমৎকার করে' সাজিয়ে দিলেন পাপিয়াকে। পুরন্দরবাবুর চোখ দুটো জলে উঠল হঠাৎ—দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে' বলে' উঠলেন—"যুগলটাকে যেমন করে' পারি ধরে' আনব আমি।" কারও বারণ না শুনে তৎক্ষণাৎ কোলকাতার দিকে ছুটলেন।

যুগলকে কোথায় পাওয়া যাবে তার আভাস তিনি একটা পেয়েছিলেন। যখন ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিলেন তখন যুগলকেও খুঁজেছিলেন তিনি। কারণ তাঁর আশা ছিল যে যুগল এলে যুগলকে দেখলে পাপিয়া হয়তো

ন.এ.—(১৩)

ভাল হয়ে যাবে। সুতরাং যুগলকে খুঁজেছিলেন তিনি প্রাণপণে। যুগল বাসা বদলায়নি, কিন্তু বাসায় গেলে পাওয়া যেত না তাকে। বাড়িওলা প্রতিবারই এক কথা বলত—"গত তিন দিন তিনি বাসাতে ফেরেন নি। আজ যদি ফেরেনও মাতাল হয়েই ফিরবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, আর ঘণ্টাখানেক থেকেই বেরিয়ে যাবেন আবার। একেবারে গোল্লায় গেল মশাই, কি আর বলব।"

চাকরটা চুপি চুপি বললে তিনি সোনাগাছিতে পড়ে থাকেন। ঠিকানা চান তো জোগাড় করে' দিতে পারি আমি।

কোলকাতায় এসেই পুরন্দরবাবু সোনাগাছির ঠিকানাটা জোগাড় করলেন। সেখানে গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ডাকিনীর মতো দুটো মাগী যুগলকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে, যুগল এত মদ খেয়েছে যে আর দাঁড়াতে পারছে না, আর তাদের পিছনে পিছনে বলিষ্ঠকায় ভীষণ দর্শন একটা লোক অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিচ্ছে তাকে। শুধু গাল দিচ্ছে নয়, টাকা না দিলে জুতিয়ে লম্বা করে দেবে বলে' ভয়ও দেখাচ্ছে। পুরন্দরবাবুকে দেখেই যুগল আর্তকণ্ঠে বলে' উঠল—গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচান আমাকে।

পুরন্দরবাবুকে দেখেই গুণ্ডাটা সরে' পড়ল, যুগল তার দিকে মুষ্টি আস্ফালন করে' চীৎকার করে' উঠল বিজয়-উল্লাসে। পুরন্দরবাবু সোজা গিয়ে যুগলের কোটের কলারটা ধরে' ঝাঁকাতে লাগলেন তাকে, ক্রমাগত ঝাঁকাতে লাগলেন, তাঁর যেন খুন চেপে গিয়েছিল। যুগলের চীৎকার থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে, আতঙ্ক ফুটে উঠল চোখের দৃষ্টিতে, দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক শব্দ হতে লাগল। ফুটপাথের উপর বসে পড়ল সে। একটা মাগী তাড়াতাড়ি ঝুঁকে ধরলে তাকে। "পাপিয়া মারা গেছে," পুরন্দরবাবু বললেন অবশেষে। ফ্যাল ফ্যাল করে' চেয়ে রইল যুগল। মনে হল যেন বুঝল কথাটা, চিবুকটা ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল একবার।

"মারা গেছে···" অদ্ভুত স্বরে ফিস ফিস করে' বললে সে। সমস্ত মুখখানা কেমন যেন কুঁচকে গেল, একটা দন্ত-সর্ব্বস্ব হাসি ফুটে উঠল মুখে। খানিকক্ষণ বসে' রইল, তারপর মাগীটার কাঁধের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে স্বরু করল সোজা—যেন পুরন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি।

"যাচ্ছেন কোথা, আপনি না গেলে যে তার সংকার হবে না এটা মাথায় ঢুকছে না, মাতলামির একটা সীমা থাকা উচিত।"

"আমি না গেলে সংকার হবে না কেন"—ঘাড় ফিরিয়ে যুগল বলল।

"আপনি আইনত তার বাবা।"

"না আমি নই, সেই পুলিশ অফিসারটি। মনে নেই আপনার তাকে? আপনি চলে আসবার ঠিক আগে যে এসেছিল—সেই যে বিলেত ফেরং ছোকরা।"

"তার মানে"—চীৎকার করে' উঠলেন পুরন্দরবাবু, সমস্ত বুকটা মুষড়ে উঠল যেন—"কি বললেন?"

"ঠিকই বলেছি, সেই ওর বাবা। সংকারের জন্যে তার খোঁজ করুন গিয়ে।"

"মিছে কথা! আমার উপর শোধ তোলবার জন্যে এই মিছে কথাটা তৈরি করেছেন আপনি। পাষণ্ড কোথকার—"

যুগলকে মারবার জন্যে তিনি ঘুঁসি তুললেন, হয় তো মেরেই ফেলতেন তাকে, কিন্তু পারলেন না—মাগী দুটো চীৎকার করে উঠল তার-স্বরে। যুগল কিন্তু এক-পা নড়ল না। খানিকক্ষণ নির্নিমেষে তাঁর দিকে চেয়ে থেকে সঙ্গিনী দুটির কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে অদৃশ্য হয়ে গেল গলির মোড়ে। পুরন্দরবাবু আর তার অনুসরণ করলেন না। করতে প্রবৃত্তি হল না।

তার পরদিন একটি ভদ্রগোছের গভর্ণমেণ্ট ক্লার্ক ভবেশবাবুদের বাড়িতে

নীলিমা দেবীর হাতে একটি খামের চিঠি দিলেন। যুগল পালিতের চিঠি। খামের ভিতর পাঁচশ টাকার একটা চেক এবং পাপিয়ার শবদাহ করবার আইন সঙ্গত অনুমতি ছিল। ভবেশবাবু অবশ্য শবদাহের ব্যবস্থা আগেই করেছিলেন, সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদও জানিয়েছিল যুগল। লিখেছিলেন— "আপনার স্নেহের ঋণ শোধ করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। তার অসুখের জন্য এবং শবদাহ প্রভৃতির জন্য যে খরচ সেই বাবদ সামান্য কিছু পাঠালাম। যদি কিছু বাঁচে কোন সৎকার্য্যে তা খরচ করে' দেবেন। আমার শরীর খুব খারাপ বলে' যেতে পারলাম না। এজন্য ক্ষমা করবেন। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।"

যে ভদ্রলোক চিঠি এনেছিলেন তিনি আর বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। যুগলবাবুর অনুরোধে তিনি চিঠিটা বহন করে' এনেছেন শুধু বোঝা গেল। টাকা পাঠিয়ে দেওয়াতে ভবেশবাবুরা ক্ষুণ্ণ হলেন খুব। চেকটা ফেরত দিচ্ছিলেন কিন্তু নীলিমা দেবী বল্লেন—কাঙালী ভোজন করানো হোক। শেষে তাই ঠিক হল।

সব শেষ হয়ে যাবার পর পুরন্দরবাবু যাদবপুর থেকে চলে এলেন। সমস্ত দিন রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন অন্যমনস্কভাবে, গাড়ীচাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন একদিন। কখনও বা নিজের বাসায় চুপ চাপ শুয়ে থাকতেন দিনের পর দিন, কোথাও বেরুতেন না, দৈনন্দিন কর্ত্তব্য করতেন না কিছু। ভবেশবাবুরা মাঝে মাঝে আসতেন, খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে' যেতেন, তিনি যাব বলে' প্রতিশ্রুতি দিতেন—কিন্তু সে কথা আর মনে থাকত না। নীলিমা দেবী নিজে এসেছিলেন কয়েকবার, কিন্তু দেখা পান নি। তাঁর উকীলও তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর মকোদ্দমার বেশ সুরাহা হয়েছে, শত্রুপক্ষ মিটমাট করতে চাইছে, পুরন্দরবাবুর সম্মতি পেলেই ব্যাপারটা নির্ব্বিঘ্নে চেপে যায়, কিন্তু কিছুতেই তাঁর নাগাল পাচ্ছিলেন না তিনি। অবশেষে নাগাল যখন পেলেন তখন তাঁর ঔদাসীন্য

দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মতো বখেড়াবাজ মক্কেল যে হঠাৎ কি করে' এতটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে তা ভেবে পেলেন না তিনি।

অসহ্য গরম পড়েছিল, কিন্তু পুরন্দরবাবুর খেয়াল ছিল না কিছু। দার্জিলিং যাবার কথা মনেই ছিল না আর। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অহরহ ভোগ করছিলেন, তিনি, একটা প্রকাণ্ড ফোড়া যেন গর নিয়ে বেড়ে উঠছিল ক্রমশ। তাকে ভালো করে' জানবার পূর্ব্বেই, তিনি যে এত অল্প সময়ে তাকে ভালোবেসেছিলেন—তা না বুঝেই পাপিয়া জন্মের মতো চলে' গেল—এইটেই তাঁকে কষ্ট দিচ্ছিল সব চেয়ে বেশী। যে আনন্দময় জীবনের সামান্য আভাসমাত্র তিনি পেয়েছিলেন, হঠাৎ তা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল চিরকালের মতো। জীবনের একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছিলেন, হারিয়ে গেল সেটা। চুপ করে' ভাবতেন কেবল বসে'—আমার এই ছন্নছাড়া অপবিত্র জীবনটা পাপিয়াকে ভালবেসে শুদ্ধ করে'—নেব ভেবেছিলাম, সারা জীবনের ক্লেদ আর বিষ অমৃতে রূপান্তরিত হয়ে যেত, ওই পবিত্র নিষ্পাপ জীবনের সংস্পর্শে এসে। তাকে মানুষ করতে পেলে বেঁচে থাকার অর্থ থাকত একটা, আর তাহলে ভগবান আমার সমস্ত দুষ্কৃতিও ক্ষমা করতেন বোধ হয়।"

একদিন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ শ্মশানে গিয়ে হাজির হলেন। যে জায়গায় তার চিতাটা সাজানো হয়েছিল সেখানে গিয়ে বসলেন খানিকক্ষণ। হেঁট হয়ে চুমু খেলেন। অনেকটা শান্তি পেলেন যেন। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল, পশ্চিম দিগন্তে মেঘস্তূপে আগুন জ্বলছে, সার বেঁধে পাখী উড়ে চলেছে, অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে। সমস্ত মনটা শান্ত হয়ে গেল অনেকদিন পরে। সমস্ত অন্তর পূর্ণ করে' একটা আশ্বাস জেগে উঠল ধীরে ধীরে। মনে হল—পাপিয়াই বোধ হয় কাছে এসে আশ্বাস দিচ্ছে আমাকে।

শ্মশান থেকে যখন উঠলেন তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে। শ্মশানের কাছেই চায়ের দোকান ছিল একটা। তাঁর মনে হল সেই দোকানের

একটা জানলায় যুগল বসে আছে এবং তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে নির্নিমেষে। তিনি সেদিকে আর না চেয়ে চলতেই লাগলেন! কিছুক্ষণ পরে মনে হল কে যেন তাঁর অনুসরণ করছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন যুগল। কিছু বললেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু। কাছাকাছি এসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে যুগল হাসল একটু। মাতালের হাসি নয়, ভদ্রলোকের হাসি। যুগল সত্যিই মদ খায় নি তখন।

"নমস্কার।"

"নমস্কার।"

১১

ভদ্রভাবে প্রতি-নমস্কার করে' নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলেন তিনি। একে দেখে আর রাগ হল না তাঁর। শুধু তাই নয়, একটা নূতন দৃষ্টি নূতন মনোভাব জাগল যেন। যুগল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে বললে—

"চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে আজ। গরম মোটে নেই।"

"আপনি এখনও যান নি দেখছি"—চলতে চলতে উত্তর দিলেন পুরন্দরবাবু।

"না। একটা না একটা বাধা উপস্থিত হচ্ছে। আমার প্রোমোশন হয়েছে, জানেন, মাইনেও বেড়েছে। পরশু নাগাদ যাচ্ছি নিশ্চয়।"

"প্রোমোশন হয়েছে ?"

"হবে না কেন"—ভ্রূযুগল উত্তোলন করে' যুগল বললে।

"না, তাই জিগ্যেস করছি…"পুরন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে' আড়চোখে চাইলেন একবার তার দিকে। লক্ষ্য করলেন যুগলের পোষাক পরিচ্ছদ আর আগেকার মতো নেই, বেশ একটু পারিপাট্য দেখা দিয়েছে।

চায়ের দোকানে বসে' কি করছিল ওখানে—পুরন্দরবাবু ভাবছিলেন মনে মনে।

"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ভালই হ'ল। একটা শুভসংবাদ আছে।"

"শুভসংবাদ ?"

"আমি আবার বিয়ে করছি।"

"সে কি !"

"দুঃখের পরে সুখ আসে, এই তো জীবন। আমি ভারী খুশী হতাম পুরন্দরবাবু যদি আপনি—কিন্তু না থাক, এখন বোধ হয় ব্যস্ত আছেন আপনি।"

"হ্যাঁ ব্যস্ত আছি, শরীরও ভাল নেই আমার।"

হঠাৎ মনে হল লোকটাকে এড়াতে পারলে যেন বাঁচেন! তার সম্বন্ধে যে নূতন মনোভাব জেগেছিল তা নিমেষে অবলুপ্ত হয়ে গেল।

"আমি ভারী খুশী হতাম যদি…"

কিসে সে খুশী হ'ত তা যুগল বললে না খুলে—পুরন্দরবাবু চুপ করে' রইলেন।

"তাহলে পরে হবে"—তার দিকে না চেয়েই পুরন্দরবাবু উত্তর দিলেন এবং চলতেই লাগলেন। যুগলও সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার, আবার দেখা হবে আশা করি।"

"নমস্কার।"

পুরন্দরবাবু যখন বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর মনের সমস্ত শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ওই লোকটার সংস্পর্শ কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না তিনি। বিছানায় যখন শুতে গেলেন তখনও তাঁর আবার মনে হল—লোকটা শ্মশানের কাছে কি করছিল?

তার পরদিন সকালে উঠে তিনি ঠিক করলেন ভবেশবাবুর ওখানে যাবেন। নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধেই ঠিক করলেন, যাবার আন্তরিক ইচ্ছে ছিল না। কারও সহানুভূতি, এমন কি ভবেশবাবুদের সহানুভূতিও, বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে। কিন্তু ভবেশবাবুরা একবার এসে তাঁর খোঁজ করেছেন, না গেলে অভদ্রতা হয়। তাঁর কেমন একটু সঙ্কোচ হতে লাগল তবু। চা খাওয়া শেষ করে' যাবেন কি যাবেন না ভাবছেন এমন সময়ে সবিস্ময়ে দেখলেন যুগল পালিত প্রবেশ করছে। পুরন্দরবাবু কল্পনাও করতে

পারেন নি যে লোকটা আবার আসবে। নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন কি বলবেন ভেবে পেলেন না। যুগল কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। হেসে নমস্কার করে' চেয়ার টেনে বসল। যে চেয়ারটায় ইতিপূর্ব্বে বসেছিল ঠিক সেই চেয়ারটাতেই বসল। পুরন্দরবাবুও প্রতি-নমস্কার করে' বসলেন। প্রথম যেদিন যুগল এসেছিল সেইদিনের ছবিটা হঠাৎ স্পষ্ট ফুটে উঠল পুরন্দরবাবুর মনে।

"আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন?" পুরন্দরবাবুর মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে যুগল বলল। যুগলের আচরণে যদিও আপাতদৃষ্টিতে লেশমাত্র আড়ষ্টতা ছিল না কিন্তু কোনও কারণে তার মনের ভিতর যে একটা তোলপাড় হচ্ছিল তা সে ঢাকতে পারছিল না। বেশবাসও বিচিত্র করে' এসেছিল। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, কোঁচানো জরি-পাড় শান্তিপুরের ধুতি, জরিদার উড়ুনি, অনামিকায় হীরের আংটি, পায়ে পাম্প্‌শু, চোখে রিমলেস চশমা, এসেন্সের গন্ধ ভুর ভুর করছে গায়ে। চশমাটা খুব সম্ভবত অলঙ্কারই, কারণ ইতিপূর্ব্বে তার চোখে চশমা ছিল না।

"আশ্চর্য্য হবারই কথা" এঁকে বেঁকে হেসে যুগল সুরু করলে আবার—"এমন ভাবে আসাটা প্রত্যাশা করেন নি, বুঝতে পারছি। কিন্তু দেখুন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা অত ঠুনকো হওয়া উচিত কি? পরস্পরের মধ্যে একটা দৃঢ়তর এবং মহত্তর বন্ধন থাকাটা কি বাঞ্ছনীয় নয় সমস্ত তুচ্ছতা সমস্ত মনোমালিন্য সত্ত্বেও? কি বলেন আপনি"?

"ভণিতা না করে' যা বলতে এসেছেন তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন" ভ্রূকুঞ্চিত করে' পুরন্দরবাবু বললেন।

"তাহলে সংক্ষেপে বলি শুনুন। কালই বলেছি তো আমি আবার বিয়ে করব। এখন আমি আমার ভাবী সহধর্ম্মিণীকে দেখতে যাচ্ছি। তারা বালীগঞ্জে থাকেন। যদি অভয় দেন তো একটা প্রস্তাব করি।"

"কি বলুন"?

"আপনার সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এবং এখন যদি আপনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন তাহলে কৃতার্থ হই"।

"আপনার সঙ্গে যাব! কোথায়?"

পুরন্দরবাবুর চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হয়ে পড়ল।

"তাদের বাড়ি। মাপ করবেন, আমার মাথার ঠিক নেই, মনের ভাব ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না হয় তো, আমার ভয় হচ্ছে আপনি পাছে 'না' বলে' বসেন"।

অতিশয় করুণ দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল পুরন্দরবাবুর মুখের দিকে।

"এখনই আপনার সঙ্গে আপনার ভাবী-সহধর্ম্মিণীকে দেখতে যাব—এই বলছেন আপনি?"

পুরন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে' সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন যুগলের দিকে। নিজের চক্ষু কর্ণকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি।

"হ্যাঁ" সলজ্জ কণ্ঠে যুগল বললে—"রাগ করবেন না, পুরন্দরবাবু। পরিহাস করছি না আমি, অনুনয় করছি, সত্যিই বলছি কৃতার্থ হব। আমার আশা আছে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারবেন না আপনি"।

"দেখুন, প্রথমত জিনিসটা অত্যন্ত অহেতুক"।

পুরন্দরবাবু অধীর ভাবে প্রতিবাদ করলেন।

"আমার প্রবল আগ্রহ, আর কিছু নয়" যুগল সানুনয়ে সুরু করল আবার—

"তাছাড়া কারণও আছে। আপনার কাছে গোপন করব না কিছু—কিন্তু সেটা ঠিক এখন, এই মুহূর্ত্তে বলতে চাই না। এখন আমার অনুরোধটুকু রাখুন শুধু..."

"কিন্তু আপনি নিজেই কি বুঝতে পারছেন না যে ব্যাপারটা কতদূর অশোভন?"

পুরন্দরবাবু দাঁড়িয়ে উঠলেন। যুগলও দাঁড়িয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

"কিছু অশোভন নয়। আমি আপনাকে আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু

হিসাবে নিয়ে যাব—এতে অশোভন কি আছে! তাছাড়া আপনি তাদের চেনেনও। বালীগঞ্জের বিশ্বম্ভর বোস—নামজাদা উকীল—কর্পোরেশনের মেম্বার—"

"তাই না কি!"

একমাস আগে এঁকে ধরবার জন্যই তিনি কি চেষ্টাটাই না করেছেন নিজের মকোর্দ্দমার স্থবিধে হবে বলে'। কিছুতেই নাগাল পান নি! তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের দিকে ছিলেন ইনি বরাবর।

"হ্যাঁ হ্যাঁ সেই লোক" পুরন্দরবাবুর মুখভাব লক্ষ্য করে' পুলিন বলে উঠল —"সেই যাব পাশে পাশে আপনি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে গল্প করছিলেন আর আমি দাঁড়িয়ে আপনাদের দেখছিলাম. আপনার কথা শেষ হয়ে গেলে আমিও তাঁকে ধরব ভেবেছিলাম সেদিন। কুড়ি বছর আগে আমরা এক অফিসে চাকরি করতাম কি না। সেদিন অবশ্য যখন আপনার কথা শেষ হবার পর তাঁকে ধরব ভাবছিলাম—তখন বিয়ের কথা ভাবিই নি! হঠাৎ সাতদিন আগে কথাটা মনে হল!"

"কিন্তু, কি মুশকিল, তাঁরা যে ভদ্রলোক"—কথাটার সম্যক অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করেই পুরন্দরবাবু সবিস্ময়ে বলে' বসলেন।

"হলই বা" পুলিনের চোখে শাণিত দৃষ্টি ফুটে উঠল একটা।

"না না মানে আমি বলছি যে যখন আমি তাদের বাড়ি গিয়েছিলাম তারা—"

"সব মনে আছে তাদের। আপনার কথা বলছিলেন, আপনাকে শ্রদ্ধা করেন তিনি। কিন্তু আপনি বাড়ির সবাইকে দেখেন নি, তারা এত—"

"তিন মাস যেতে না যেতেই বিয়ে করবেন আপনি!"

"না, বিয়ে অত তাড়াতাড়ি হবে না। তার এখনও বছর খানেক বাকী। না, না আপনি যা ভাবছেন তা নয়, তাঁরা আমাকে অনেকদিন থেকে চেনেন। আমার স্ত্রীকেও চিনতেন। সব জানেন আমার। তাছাড়া সম্পত্তি আছে

আমার, চাকরিও পেয়েছি ভাল একটা, মাইনেও বাড়ল—আপত্তি নেই কিছু তাদের"।

"তাঁর মেয়ের সঙ্গে ?"

"সে সব বলব এখন" এঁকে বেঁকে বিগলিত হয়ে পড়ল যেন যুগল "আগে একটা সিগারেট ধরাই। আজই দেখবেন তাকে। একটা কথা কি জানেন, বিশ্বম্ভর বাবু রোজগার করছেন খুব কিন্তু রাখতে পারেন নি তেমন কিছু। আজকালকার খর চ তো জানেনই, তাছাড়া বালীগঞ্জে বাড়ি করতে গিয়ে জমানো টাকাটা খরচ করে' ফেলেছেন সব। বিরাট পরিবার, মেয়েই আটটি—ছেলে একটিমাত্র, সে ছেলেও মানুষ হয়নি এখনও। কাল যদি চোখ বোজেন তু'বেলা অন্ন জুটবে কিনা সন্দেহ। আটটা মেয়ে—তাদের কাপড় চোপড়ের খরচেই তো ফতুর হবার কথা—তাদের পড়িয়েছেন প্রত্যেককে। এদের মধ্যে পাঁচটি বেশ প্রাপ্তযৌবনা, বড়টির বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে, খাসা মেয়ে, আলাপ করে' দেখবেন। ষষ্ঠটির বয়স বছর পনেরো হবে—স্কুলে পড়ে। আগের পাঁচটির বিয়ে হয় নি কারও, আজকাল, মেয়ের বিয়ে মানে বুঝতে পারেন তো, কি ব্যাপার! নানা জায়গায় পাত্র খুঁজছিলেন ভদ্রলোক এমন সময় আমি গিয়ে হাজির। আমার মতো পাত্র একটিও জোটে নি ইতিপূর্ব্বে। জানাশোনা ঘর, লেখাপড়া জানে, খেতে পরতে পাবে এরকম ছেলে খুব সুলভ তো নয়—আত্মপ্রশংসা করছি না—কিন্তু আমার মতো পাত্র বিনাপণে পাওয়া অসম্ভব হবে ওঁর পক্ষে"।

সোচ্ছ্বাসে বলে চলেছিল যুগল।

"আপনি বড়টিকে বিয়ে করেছেন ?"

"না মানে, বড়টিকে না। আমি ষষ্ঠটি মানে যেটি স্কুলে পড়ছে তার কথাই বলেছি"।

"সে কি!" হেসে ফেললেন পুরন্দরবাবু, "তার বয়স মোটে পনেরো বলছেন!"

"হ্যাঁ, এখন পনরো, আর ন'মাস পরেই ষোলয় পড়বে। তাতে হয়েছে কি! এখন বিয়ে করাটা দৃষ্টিকটু হবে অবশ্য, কথাটা পাকাপাকি হয়ে থাকবে শুধু—আহা আপনি আমাকে এতই অবুঝ মনে করেছেন!"

"ও, তাহলে এখনও কিছুই ঠিক হয় নি—"

"হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে বৈকি।"

"সে মেয়েটি একথা জানে?"

"মেয়ের বাবা মা তাকে হয়তো বলেন নি কিছু, একটা ইয়ে আছে তো, কিন্তু আমার মনে হয় সে জানে ঠিক" চোখ কুঁচকে হেসে ফেললে যুগল পালিত। তারপর বললে—

"এখন বলুন কি বলছেন—"

"আমি সেখানে গিয়ে করব কি!"

"পুরন্দরবাবু—"

"এ তো অদ্ভুত আবদার দেখছি আপনার।"

রাগে ঘৃণায় পুরন্দরবাবুর মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না।

একি অদ্ভুত বেহায়া লোক!

"চলুন, বুঝলেন, আমি বলছি, ভালই লাগবে আপনার।"

গদগদকণ্ঠে অনুরোধ করতে লাগল যুগল—"না, না, না, শুনুন" পুরন্দরবাবুর অধীর ভাব লক্ষ্য করে' ব'লে উঠল সে আবার, "শুনুন, সব কথা তারপর ঠিক করবেন যা হয়। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন বোধ হয়। আপনার বন্ধুত্ব দাবী করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই, আমি একটা অনুগ্রহ চাইছি শুধু। আর এতে আপনি ভবিষ্যতে বিপন্নও হবেন না কোন রকমে তাও শপথ করে' বলতে পারি। তাছাড়া পরশুদিন তো চলেই যাচ্ছি আমি, আপনাকে আর বিরক্ত করতে আসব না, শুধু আজকের দিনটি দয়া করুন একটু। আপনার মহত্ত্বে বিশ্বাস করি বলে' অনেক আশা করে এসেছি! হয়তো ইদানীং আমার প্রতি একটু করুণাও হয়ে থাকবে আপনার—আমার মতো

হতভাগার প্রতি যে কোন লোকেরই করুণা হওয়া উচিত, আপনার মতো উদার লোকের তো···সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছি না—"

হঠাৎ যুগলের গলা কেঁপে গেল, আর কিছু বলতে পারলে না সে। পুরন্দরবাবু সবিস্ময়ে চাইলেন তার দিকে।

"আপনি আমাকে ঠিক যে কি করতে বলছেন তাও তো বুঝতে পারছি না, সাধ্যাতীত না হলে আমি তা—"

"আপনি এখন আমার সঙ্গে চলুন, তাহলেই উপকৃত হব। তারপর ফেরবার পথে, বিশ্বাস করুন, সমস্ত খুলে বলব আমি—বিশ্বাস করুন।"

পুরন্দরবাবু তবু রাজি হলেন না, বিশেষ করে' নিজেরই অন্তরে দুষ্ট বাসনার গোপন সঞ্চরণ অনুভব করছিলেন বলে' আরও হলেন না। যুগল আবার বিয়ে করছে শোনামাত্রই মনের সুপ্ত অজগরটা নড়াচড়া সুরু করেছিল অনেক আগে থেকেই। হয়তো কৌতূহল, কিম্বা হয়তো নিগূঢ় আরও কিছু—রাজি হয়ে যেতে লোভ হচ্ছিল এবং যতই লোভ হচ্ছিল ততই দমন করবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। টেবিলের উপর দুই কুনুইয়ের ভর দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন এবং মনে মনে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। যুগল ক্রমাগত খোসামোদ করে' যেতে লাগল।

"বেশ চলুন"—হঠাৎ ঠিক করে' ফেললেন তিনি, মনের ভিতরটা কেমন করতে লাগল যদিও। উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ঠেলে। যুগলের আনন্দের সীমা রইল না।

জামা কাপড় বদলাতে হবে কিন্তু, এই বেশে যাবেন না কি—তা হবে না। ভাল কাপড় জামা বার করুন, চুলটা আচড়ান, আনন্দে উৎফুল্ল যুগল ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আমি কি পরে যাব তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন লোকটা—পুরন্দরবাবুর মনে হল একবার।

একটু পরেই বেরিয়ে পড়লেন তিনি যুগলের সঙ্গে। যুগল প্রশংসমান দৃষ্টিতে

তাঁর পোষাকের পারিপাট্য দেখতে লাগল বারবার ; শ্রদ্ধা যেন উথলে উঠতে লাগল আরও। পুরন্দরবাবু বিস্মিত হচ্ছিলেন, শুধু তার আচরণে নয়, নিজের আচরণেও। বাইরে চমৎকার গাড়ি অপেক্ষা করছিল একখানা।

"ও আমার জন্যে গাড়িও আপনি আগে থাকতেই ঠিক করে এনেছিলেন ?"

"গাড়ি আমি নিজের জন্যেই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আপনি যে যাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না আমার" একমুখ হেসে যুগল বললে।

"আপনাকে নিয়ে জ্বালাতন" গাড়িতে চড়ে হেসে অনুযোগ করলেন পুরন্দরবাবু।

"প্রশ্রয় দিয়েছেন বলেই জ্বালাতন করি" গাঢ়কণ্ঠে যুগল উত্তর দিল।

গাড়ি চলতে সুরু করল।

"আর পাপিয়া ?" কথাটা একবার মনে হল কিন্তু জোর করে' সেটাকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন পুরন্দরবাবু। তাঁর মনে হতে লাগল একটা পবিত্র জিনিস অশুচি হয়ে গেল যেন। সহসা নিজেকে অত্যন্ত হীন, অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে হ'তে লাগল। ইচ্ছে করতে লাগল গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ি এবং যুগল যদি বাধা দেয় তার গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিই একটা। কিন্তু কিছুই হল না। যুগল মনের আনন্দে বকর বকর করতে লাগল ; প্রলোভনটা আবার তাঁর মন জুড়ে বসল।

"আচ্ছা পুরন্দরবাবু, দামী পাথরের সম্বন্ধে কোনও ধারণা আছে আপনার ?"

"কি পাথর ?"

"হীরে।"

"আছে কিছু কিছু।"

"আমার একটা উপহার নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। নেব ?"

"এখন ওসব কেন !"

"ক্ষতি কি তাতে। কি কিনি বলুন ত ? ব্রোচ, দুল, ব্রেসলেট—একটা 'সেট' নিলে কেমন হয়, না শুধু একটা জিনিসই নেব ?"

"কত টাকা খরচ করবেন আপনি ?"

"হাজার দুই আড়াই।"

"এত ?"

"বেশী মনে হচ্ছে আপনার ?" অপ্রতিভ হয়ে গেল যুগল একটু।

"একটা ব্রোচ কিম্বা একটা দুল নিয়ে যান বড় জোর, এত খরচ ক'রে কি হবে এখন ?"

যুগল মুষড়ে গেল। অনেক টাকা খরচ করে' একটা 'হোল সেট' কিনে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে। একটা গয়নার দোকানে গাড়ি দাঁড়াল। পুরন্দরবাবু আবার বেশী টাকা খরচ করতে মানা করলেন। শেষে একজোড়া ব্রেসলেট কেনা হ'ল—তাও যুগল যেটা পছন্দ করছিল সেটা নয়, পুরন্দরবাবু ওর মধ্যে সস্তা দেখে একজোড়া বেছে দিলেন। দাম মাত্র ৩০০৲ টাকা শুনে যুগলের মন আরও দমে' গেল। বেশী দামী কিনলে কি ক্ষতি ছিল!

"ভাল একটা জিনিস কিনে দিলেই হ'ত" গাড়িতে চড়ে' যুগল বলতে লাগল—"অতবড় সংসার, অতগুলি মেয়ে, বেচারারা গয়না কি পরতে পায়।" একটু পরে ফিক করে হেসে আবার সুরু করলে সে—'পনের বছর বয়স শুনে আপনি হাসছিলেন। কিন্তু ওই কম বয়স বলেই আমি আরও মজেছি। বেণী দুলিয়ে বই খাতা বগলে নিয়ে এখনও স্কুলে যায়,—হি-হি। মানে নিষ্পাপ, ওইতেই মুগ্ধ করেছে আমাকে, রূপে নয়। স্কুলে যায়, হুড়োহুড়ি করে, কথায় কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ে, সে কি হাসি—আর কি নিয়ে হাসি শুনবেন, বেরালটা সিন্দুক থেকে লাফিয়ে পড়ে' কেমন বলের মতো চলে গেল, সংসারের কিছু জানে না এখনও—একবারে কচি—হি—হি।"

পুরন্দরবাবু নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন।

মাঝে মাঝে তাঁর মনে হচ্ছিল—"আমাকে জোর করে' নিয়ে যাচ্ছে কেন ? কোনও মতলব নেই তো! ফাঁদে ফেলবে না কি ? সত্যি আমার মহত্ত্বের উপর এখনও বিশ্বাস আছে ওর! লোকটা কি! ভাঁড়, বেকুব, পাগল—না আর কিছু!"

১২

পুরন্দরবাবু যা বলেছিলেন বিশ্বম্ভরবাবুরা সত্যিই ভদ্র পরিবার। বিশ্বম্ভরবাবু নিজে একজন পদস্থ এবং সম্মানিত লোক, সকলে তাঁকে খাতির করে। তাঁর আয়ের সম্বন্ধেও যুগল যা বলেছিল তা ঠিক। যতদিন তিনি রোজকার করছেন স্বচ্ছন্দে চলে' যাচ্ছে বেশ, কিন্তু তিনি চোখ বুজলেই সংসার অচল হয়ে পড়বে।

বিশ্বম্ভরবাবু পুরন্দরবাবুকে বেশ সহৃদয় ভদ্রতাসহকারে অভ্যর্থনা করলেন। মকোর্দ্দমা নিয়ে তাঁর সঙ্গে যে প্রচ্ছন্ন শত্রুতাটা হয়েছিল সেটা অবলুপ্ত হয়ে গেল যেন।

“খুব ভাল হয়েছে” প্রথমেই আরম্ভ করলেন তিনি, “আপোষে যে আপনারা মিটমাট করে' ফেলেছেন খুব ভাল হয়েছে এটা। আমারও তাই ইচ্ছে ছিল, আর আপনার উকীল পরেশবাবু তো অসাধারণ লোক এসব বিষয়ে। ভাল হয়েছে। কোন হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি আপনি তিন লক্ষ টাকা পেয়ে যাবেন। মকোর্দ্দমা চালালে অন্তত তিনটি বছর নাকানি চোকানি খেতে হ'ত আপনাদের দুজনকেই। এ খুব ভাল হয়েছে—”

বিশ্বম্ভরবাবু আলোক-প্রাপ্ত সমাজের লোক, তাঁর পিতা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং পরদার বালাই নেই। একটু পরেই বিশ্বম্ভরবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে পুরন্দরবাবুর আলাপ হয়ে গেল। শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী দেবী স্থূলকায়া প্রবীণা। চোখে মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। দেখলেই মনে হয় যেন অবসন্ন তিনি। আলাপ করলে মার্জ্জিতরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। একটু

পরেই তাঁর মেয়েরাও এল একে একে। পুরন্দরবাবু দিশাহারা হয়ে পড়লেন। একটি দুটি নয়, দশ বারোটি যুবতী সমবেত হলেন একে একে এসে। চলেও গেলেন। তাঁরা বিশ্বম্ভরবাবুর মেয়েদের বান্ধবী বোঝা গেল। পাড়ায় থাকেন। বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়িটা বিশাল, নানাসময়ে জোড়া-তাড়া দিয়ে তৈরি। সামনে অনেকখানি জমি, প্রকাণ্ড বাগান। কথাবার্ত্তা থেকে বোঝা গেল যে তাঁরা পুরন্দরবাবুর আগমন প্রত্যাশা করছিলেন এবং যুগলের বন্ধু হিসেবেই বিশেষ করে' সম্বর্দ্ধনা করলেন তাঁর। তিনি আসাতে সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠল খুব।

পুরন্দরবাবু অভিজ্ঞ লোক। একটা জিনিস সন্দেহ হ'তে লাগল তাঁর। এই অত্যুচ্ছ্বসিত সম্বর্দ্ধনায়, মেয়েদের বেশবিন্যাসের পারিপাট্যে তাঁর মনে হতে লাগল যে যুগল বোধ হয় আকারে ইঙ্গিতে এদের কাছে-প্রকাশ করেছে যে তিনি এখনও বিয়ে করেন নি, তাঁর বিষয় সম্পত্তি আছে, বনেদি বংশের ছেলে তিনি, অজস্র সময় এবং সম্পত্তি নিয়ে কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না, সুতরাং এইবার বোধ হয় বিয়ে করে' সংসারী হতে পারেন—বিশেষতঃ এত বড় মকোর্দ্দমাটা নির্ব্বিবাদে মিটে গিয়ে অতগুলো টাকা পেয়ে গেলেন যখন। বড় মেয়ে সুমিতা—যাকে যুগল 'খাসা মেয়ে' বলে' বর্ণনা করেছিল—তার আচরণে সন্দেহটা আরও বদ্ধমূল হতে লাগল পুরন্দরবাবুর মনে। তার শাড়ি, ব্লাউস, চুল বাঁধবার ধরণ, সলজ্জ দৃষ্টি প্রভৃতি অন্যগুলির থেকে একটু স্বতন্ত্র বলে' ঠেকল তাঁর কাছে। তার বোনেদের এবং তাদের বান্ধবীদের ধরণ থেকেও প্রতীয়মান হতে লাগল যেন সুমিতার দৌলতেই তারা পুরন্দরবাবুর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছে—অর্থাৎ যেন তিনি সুমিতাকে "দেখতে এসেছেন" এবং এরা সবাই তা আগে থাকতে জানে। তাদের ব্যবহার এবং মাঝে মাঝে দু' একটা কথাও বা প্রকাশ করতে লাগল তার অন্য কোন মানে হয় না আর। সুমিতা মেয়েটি লম্বা, ফরসা। তন্বী নয়, দোহারা। মুখখানি ভারী মিষ্টি। বেশ শান্ত শিষ্ট ভদ্র। পুরন্দরবাবুর মনে হতে লাগল এরকম

মেয়ের বিয়ে হয়নি কেন এখনও? আশ্চর্য্য তো। পণের জন্যে আটকেছে সম্ভবত। এখনও দেখতে বেশ সুশ্রী আছে, কিন্তু এর পর দেখতে দেখতে মোটা হয়ে যাবে, তখন...”। বিশ্বম্ভরবাবুর অন্য মেয়েগুলিও দেখতে বেশ। তাদের বান্ধবীদের মধ্যেও অনেক রূপসী ছিল। পুরন্দরবাবু স্মিতার দিকেই মনটাকে একাগ্র রাখতে পারলেন না। তাছাড়া বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ছিল তাঁর।

পারুল—ষষ্ঠী ভগ্নীটি, যে স্কুলে পড়ে, যুগল পছন্দ করেছে যাকে—সে অনেকক্ষণ পরে এল। পুরন্দরবাবু যে কতটা আগ্রহভরে তার আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন তা আবিষ্কার করে’ নিজেই বিস্মিত হলেন, ধিক্কারও দিলেন নিজেকে তার জন্যে। কিন্তু আগ্রহটা কমল না। পারুলের আবির্ভাবে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল বেশ। পারুলের সঙ্গে এল কঙ্কনা—ছিপছিপে শ্যামবর্ণের মেয়েটি, তীক্ষ্ণ মুখশ্রী, চোখের দৃষ্টি চকমক করছে, বুদ্ধির দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে মুখভাবে। তাকে দেখে যুগল একটু তটস্থ হয়ে পড়ল। কঙ্কনার বয়স বছর তেইশ হবে। তার বাক্য করবার ক্ষমতা নাকি অসাধারণ। স্কুলে মাষ্টারি করে, পাশের বাড়িতে থাকে। কিন্তু সে বিশ্বম্ভরবাবুদের বাড়িরই একজন হয়ে গিয়েছিল প্রায়। বাড়ির সব মেয়েরা ‘কঙ্কনা দি’ বলতে অজ্ঞান। পারুলের তো তাকে ছাড়া চলতই না। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরন্দরবাবু বুঝতে পারলেন যে একটি মেয়েও যুগলের উপর প্রসন্ন নয়; পাড়ার মেয়েরাও নয়। পারুলের ভাবভঙ্গী থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে সে যুগলকে ঘৃণা করে। পুরন্দরবাবু এও লক্ষ্য করলেন যে যুগল এ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার। হয় সে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না, কিম্বা বুঝতে চাইছে না।

সবগুলির মধ্যে পারুলই সব চেয়ে দেখতে ভাল। রং তত ফরসা নয় কিন্তু অপরূপ। একটা বন্যশ্রী তার সর্ব্বাঙ্গে যেন মূর্ত্ত হয়ে রয়েছে এখনও পোষ মানে নি, মানবার কোন লক্ষণও নেই। উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে দুষ্টুমি মাখানো, মুখের হাসিতে ছোট্ট একটু মিষ্টি খোঁচ, চমৎকার ঠোঁট দুটি, চকচকে

দাঁত, তন্বী দেহটি পেলব বন্যবল্লরীর মতো, মুখভাবে শিশুর সাপল্যের সঙ্গে মিশেছে আসন্ন যৌবনের পূর্বাভাষ। তার বয়স যে পনেরোর বেশী নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল তার প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি কথায়।

যুগলের উপহার দেওয়া ব্যাপারটা মোটেই জমল না, হাস্যকর হয়ে উঠল। একটু অপ্রীতিকরও। পারুল ঘরে ঢুকতেই দেঁতো হাসি হেসে যুগল এগিয়ে গেল এবং পকেট থেকে ব্রেসলেটের বাক্সটা বার করে বললে—"এর আগের দিন তোমার গান শুনে এত ভাল লেগেছিল যে তোমার জন্যে প্রাইজ এনেছি একটা—হেঁ—হেঁ।" আর বলতে পারল না, কথাটা আটকে গেল, অসহায়-ভাবে বাক্সটা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। পারুল নেবার জন্যে হাত বাড়াল না দেখে জোর করে' তার হাতে গুঁজে দিতে গেল। রাগে লজ্জায় চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল পারুলের, সে হাত সরিয়ে নিয়ে মায়ের দিকে ফিরে বললে—আমি নেব না।

বিশ্বম্ভরবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—"নাও না, তাতে কি হয়েছে, এনেছেন যখন তোমার জন্যে, নাও। নিয়ে ধন্যবাদ দাও।" কিন্তু তাঁর মুখ চোখ দেখে মনে হল তিনিও অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যুগলের দিকে চেয়ে বললেন "কি দরকার ছিল এসবের—"

পারুল যখন দেখলে না নিয়ে উপায় নেই, তখন নিতেই হল তাকে। "ধন্যবাদ"টা কোনক্রমে উচ্চারণ করে' মুখ টিপে মায়ের পাশে গিয়ে বসল সে, নাকের ডগাটা কাঁপতে লাগল তার। তার এক বোন উঠে গেল কি দিয়েছে দেখবার জন্যে। বাক্সটা না খুলেই পারুল তাকে দিয়ে দিলে সেটা। যুগলকে দেখিয়ে দিলে যে তার দেওয়া উপহারকে গ্রাহ্যই করে না সে। ব্রেসলেট জোড়া হাতে হাতে ঘুরতে লাগল, কেউ বিশেষ কিছু মন্তব্য করলেন না, ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল কারো কারো চোখের দৃষ্টিতে। হেমাঙ্গিনী দেবীই কেবল মৃদুস্বরে প্রশংসা করলেন একটু। যুগল মরমে মরে গেল। পুরন্দরবাবুই আবহাওয়াটাকে স্বচ্ছ করে' তুললেন শেষে। কথা কইতে আরম্ভ করলেন,

যা মনে এল তাই নিয়েই সুরু করলেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেল, সবাই মন দিয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগল। ওস্তাদ আড্ডাধারী ছিলেন পুরন্দরবাবু এককালে. আড্ডা জমাবার কৌশল জানা ছিল তাঁর ভাল করেই। যা হোক কিছু একটা কায়দা করে' সুরু করলেই জমে যায়। কখনও সরসতা, কখনও সরলতা, কখনও পরচর্চ্চা, কখনও রাজনীতি, দুচার লাইন কবিতা, দুচারটে রসিকতা নানা মন্ত্র জানা ছিল তাঁর। কিন্তু এক্ষেত্রে নিজের অন্তর থেকেই একটা বিশেষ প্রেরণা পাচ্ছিলেন তিনি, অপরকে আকর্ষণ করবার শক্তি যে তাঁর আছে তা যেন সচেতন ভাবে অনুভব করছিলেন এবং তারই মাদকতায় উৎফুল্ল হয়ে উঠছিলেন ক্রমশ। এখনই যে সকলে তাঁর দিকে ফিরে তাকাবে, সাগ্রহে তাঁর কথাই শুনবে, তাঁর সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে আলাপ করবে না, তাঁর রসিকতাতেই হাসবে কেবল—এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সত্যিই বেশ জমে উঠল একটু পরে। আরও তিন চারজন যোগ দিলে গল্পগুজবে হাসি ঠাট্টায়। পরকে আপন করে' দলে টেনে নেবারও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল পুরন্দরবাবুর। হেমাঙ্গিনী দেবীর মুখ থেকেও ক্লান্তির ছায়া অপসারিত হয়ে হাসির আলো ফুটল। সুমিতার তো কথাই নেই, মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসে পুরন্দরবাবুর কথা শুনছিল সে। পারুল কিন্তু একটু সন্দেহের চক্ষে দেখছিল পুরন্দরবাবুকে, তার ভ্রূভঙ্গী থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তা। এতে পুরন্দরবাবুর উৎসাহ আরও বেড়ে যাচ্ছিল যেন। কঙ্কনাও যোগ দিয়েছিল আলাপে, পুরন্দরবাবুকে ঠাট্টা করতেও ছাড়ে নি একটু। "যুগলবাবু বলছিলেন আপনি তাঁর বাল্যবন্ধু, তাহলে আপনার বয়সও তো নিতান্ত কম নয়! পঞ্চাশের উপর তো হবেই, নয়? অথচ আপনাকে কত কমবয়সী মনে হচ্ছে"—মাথা দুলিয়ে মিছে কথাটা বানিয়ে বলেছিল সে, কিন্তু তারও পুরন্দরবাবুকে ভালই লাগছিল। যুগল কিন্তু একেবারে মুষড়ে গিয়েছিল। পুরন্দরবাবুর ক্ষমতা অবশ্য জানা ছিল তার এবং এখানে তাঁর সাফল্যে সে উল্লসিতও হচ্ছিল

প্রথম প্রথম, যোগ দেবারও চেষ্টা করছিল তাঁর রসিকতায়, কিন্তু পুরন্দরবাবুর স্বতোৎসারিত আবেগের কাছে দাঁড়াতে পারছিল না সে। ক্রমশ সে গম্ভীর হয়ে পড়ল। শেষে তার মুখ দেখে মনে হতে লাগল অত্যন্ত দমে গেছে বেচারা।

"আপনি তো ঘরের লোক হয়ে গেলেন, আপনার সঙ্গে আর ভদ্রতার ভান করবার দরকার নেই। আমার একটু কাজ আছে, উঠি এবার। ছুটির দিনেও নিস্তার নেই মশাই, মকোর্দ্দমার কাগজপত্তর জমে' আছে এক গাদা। আপনার সম্বন্ধে কি ভুল ধারণাই ছিল আমার—ভেবেছিলাম অহঙ্কারী গোমড়া-মুখো ছিটগ্রস্ত লোকটা—এখন দেখছি ঠিক উলটো। মানুষ কত ভুলই করে। আচ্ছা, চলি আমি।"

বিশ্বম্ভরবাবু চলে গেলেন। ঘরের কোনে পিয়ানো ছিল একটা। পুরন্দরবাবু প্রশ্ন করলেন—"এ যন্ত্রটি বাজায় কে ?"

তারপর পারুলের দিকে হঠাৎ ফিরে বললেন—"তুমি নিশ্চয় গাইতে পার।"

"কে বললে আপনাকে" ফোঁস করে' উঠল যেন পারুল।

"এক্ষুণি তো যুগলবাবু বললেন।"

"ওটা মিছে কথা। আমার গানের গলা নেই।"

"আমারও গানের গলা নেই। তবু আমি গাই মাঝে মাঝে।"

"আপনি গাইবেন ? আমিও গাইব তাহলে"—হঠাৎ পারুলের চোখ দুটোতে আলো ঝলমল করে' উঠল—"কিন্তু এখন নয়, খাবার পরে। গান খুব ভালো লাগে না আমার, জানেন—দিন রাত প্যান প্যান—বিচ্ছিরি—পিয়ানোটার জ্বালায় অস্থির—দিদি তো সকাল নেই সন্ধে নেই টুংটাং করছেই। দিদির গান অবশ্য শোনবার মতো—"

পুরন্দরবাবু এ সূত্র ছাড়লেন না। সুমিতা সত্যই রোজ পিয়ানো সাধে। পুরন্দরবাবু সুমিতাকে অনুরোধ করাতে সবাই পুলকিত হল—হেমাঙ্গিনী

দেবী তো গদগদ হয়ে পড়লেন একেবারে। একটু মুচকি হেসে সুমিতা উঠে পিয়ানোর কাছে গেল। হঠাৎ ভয়ানক লজ্জা হল তার, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল, নিজের কাছেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল সে এতে—চব্বিশ বছরের বুড়ো ধাড়ি মেয়ে সে, কচি খুকীর মতো একি অশোভন লজ্জা তার, এ অপ্রতিভ ভাবটাও ফুটে উঠল মুখে। কোনক্রমে আত্মসম্বরণ করে' টুলটার উপর বসে' পড়ল সে। দু'চারটে গামুলি গৎ গামুলিভাবেই বাজালে। ভারী লজ্জা করছিল তার। পুরন্দরবাবু কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন প্রশংসায়। গৎগুলোরই প্রশংসা করলেন বেশী, বাদিকার তত নয়। কিন্তু সুমিতা এত সূক্ষ্ম প্রভেদ ধরতে পারল না। সে হৃষ্ট হয়ে উঠল খুব এবং এমন তন্ময় হয়ে পুরন্দরবাবুর সঙ্গীতবিষয়ক আলোচনা শুনতে লাগল যে পুরন্দরবাবুও তার প্রতি একটু আকৃষ্ট না হয়ে পারলেন না। "বাঃ বেশ মেয়েটি তো"—ফুটে উঠল তাঁর দৃষ্টিতে এবং তা সবাই বুঝতেও পারল, বিশেষ করে' সুমিতা নিজে।

"আপনাদের বাগানটা তো চমৎকার" হঠাৎ জানলা দিয়ে চেয়ে পুরন্দরবাবু বললেন—"চলুন না বাগানেই যাওয়া যাক, ঘরের ভেতর কেন, এমন বাগান থাকতে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন" প্রায় সবাই বলে' উঠল সমস্বরে, যেন সকলের মনের কথাটা পুরন্দরবাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

সবাই বাগানে নেমে গেল এবং সন্ধ্যে পর্য্যন্ত রইল সেখানে। হেমাঙ্গিনী দেবীর যদিও একটু ঘুমিয়ে নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পাছে পুরন্দরবাবু কিছু মনে করেন এই ভেবে তিনি আর ঘুমুতে গেলেন না। কিন্তু বাগানে নেমে হুড়োহুড়ি করতেও প্রবৃত্তি হল না তাঁর, তিনি বারান্দায় বেরিয়ে একটা চেয়ারে বসে' ঢুলতে লাগলেন। পুরন্দরবাবু বাগানে গিয়ে খুব জমিয়ে ফেললেন মেয়েদের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরেই পাড়ার আরও কয়েকটি ছোকরা এসে জুটল। একজন কলেজে পড়ে, আর একজন ম্যাট্রিকের গণ্ডী

পেরোয় নি। তাদের দেখে তাদের বান্ধবীরা অভ্যর্থনা করে' নিলে। নীল চশমা-পরা উসকো-খুসকো চুল তৃতীয় আর একটি ছোকরা এল। সে এসেই পারুল আর কল্পনাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে চেয়ে ভুরু কুঁচকে ফুসফুস গুজগুজ করতে লাগল। বোঝা গেল পুরন্দরবাবুর অভ্যাগমে অসন্তুষ্ট হয়েছে সে এবং বাগে পেলে তাঁকে এক হাত দেখিয়ে দিতেও ছাড়বে না।

"আসুন কিছু খেলা যাক"—অনেকগুলি মেয়ে বললে।

"কি খেলবে? কি তোমরা খেল রোজ?"

"সব রকম। লুকোচুরি, কানামাছি, ব্যাডমিণ্টন। সন্ধ্যের সময় কিন্তু আমরা নতুন খেলা খেলি একটা—কিম্বদন্তী।"

"সে আবার কি?"

"আমরা সবাই মিলে বসব একটা ঘরে। একজন বাইরে চলে যাবে। তারপর আমরা একটা কিম্বদন্তী ঠিক করব—এই যেমন ধরুন 'অতি দর্পে হত লঙ্কা'! তারপর যে বাইরে চলে গেছে তাকে ডাকা হবে। আর আমরা তাকে এক একটা বাক্য বলব। একজন মনে করুন বললে 'অতিশয় লোভ ভাল নয়' এর মধ্যে 'অতি' কথাটা আছে, আর একজন বললে 'দর্পনারায়ণ ঠাকুর বড়লোক ছিলেন, এর মধ্যে 'দর্প' কথাটা আছে। সকলের কথা শুনে তাকে কিম্বদন্তীটা বার করতে হবে।"

"বাঃ বেশ মজার তো" পুরন্দরবাবু বললেন।

"না, মোটেই মজার নয়। খানিকক্ষণ পরে বিরক্ত ধরে' যায়" বলে' উঠল দু'তিনজন।

"কিম্বা আমরা থিয়েটার থিয়েটার খেলি অনেক সময়'—পারুল বললে—"ওই যে বড় বটগাছটা দেখছেন—যার সামনে চৌতারা আছে একটা—ওইখানে। বটগাছের পেছনটা আমাদের গ্রীনরুম। ওইখানে কেউ রাজা, কেউ রাণী, কেউ মন্ত্রী সেজে বসে থাকি। যার যা খুশী। তারপর গ্রীনরুম

থেকে যখন যার খুশী বেরিয়ে এসে যা মনে আসে বলে যেতে হয়। আর সবাই বসে শোনে—"

"এটাও তো বেশ" পুরন্দরবাবু বললেন।

"যত বেশ ভাবছেন তত নয়" পারুলই প্রতিবাদ করলে ঠোঁট উলটে—"ভারী বিরক্তিকর হয়ে যায় মাঝে মাঝে। কেউ কিছু বলতে পারে না ভাল করে'। তবে আপনি যদি নাবেন হয় তো ভাল হবে। জানেন, আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম সত্যিই বুঝি আপনি যুগলবাবুর বন্ধু। এখন দেখছি সেটা বাজে কথা। বানিয়ে গল্প করেছিলেন ভদ্রলোক।"

"আমার ওপর রাগ নেই তাহলে তো আর?"

"আমার তো খুব ভাল লাগছে"—মুচকি হেসে ছুটে চলে গেল পারুল কঙ্কনার কাছে।

অপরিচিতা একটি মেয়ে এগিয়ে এসে পুরন্দরবাবুর কাণে কাণে বললে 'আজ সন্ধ্যেবেলা আমরা 'কিম্বদন্তী' খেলব। যুগলবাবুকে জব্দ করতে হবে, আপনি আমাদের দিকে, বুঝলেন?"

আর একটি মেয়েকেও ইতিপূর্ব্বে ভাল করে' লক্ষ্য করেন নি পুরন্দরবাবু। কটা চুল, কটা চোখ, মুখে ব্রণের দাগ—এগিয়ে এসে আলাপ করলে পুরন্দরবাবুর সঙ্গে। ধপধপে ফরসা রং—মুখ লাল হয়েছে রোদের তাতে। একমুখ হেসে বললে—"আপনি এসেছেন, বেশ হয়েছে। সময়টা কাটবে ভাল। এমন একঘেয়ে লাগে রোজ।"

যুগল পালিতের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হচ্ছিল। খানিকক্ষণ পরেই পুরন্দরবাবুর সঙ্গে পারুলের ভাব হয়ে গেল বেশ। তার চোখে আর সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রইল না। সে স্বচ্ছন্দে হাসছিল, লাফাচ্ছিল, চীৎকার করছিল, পুরন্দরবাবুর হাত ধরে টেনেও ছিল বার দুই, আনন্দ উথলে পড়ছিল যেন তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে। যুগলকে কিন্তু সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছিল না, তার ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছিল যেন যুগলের অস্তিত্বকেই সে স্বীকার করছে না।

যুগল যেন নেই। পুরন্দরবাবু বেশ বুঝতে পারলেন যে সবাই মিলে যুগলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে একটা। পারুল এবং আরও কয়েকটি মেয়ে পুরন্দরবাবুকে টেনে নিয়ে একদিকে চলে গেল, আর একদল মেয়ে যুগল পালিতকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেল ঠিক বিপরীত দিকে। কিন্তু যুগল হঠাৎ ছটকে বেরিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে এল পারুলরা যেখানে ছিল এবং এসেই পারুল ও পুরন্দরবাবুর মাঝখানে নিজের টেকো মাথাটা হঠাৎ গুঁজে দিয়ে একটা অস্বস্তির হাসি হাসতে লাগল হাঁপাতে হাঁপাতে। আদব-কায়দা শোভনতা-অশোভনতা কোন কিছুরই তোয়াক্কা করছিল না আর সে যেন। সমস্ত আবরণ উড়িয়ে দিয়ে নিজের মনোভাবটা স্পষ্ট করবার চেষ্টা করছিল কেবল প্রাণপণে। পুরন্দরবাবু পারুলকে ছেড়ে সুস্মিতার দিকে যদি একটু মন দেন তাহলে বেচারা বেঁচে যায় যেন। সুস্মিতাকে একবার লেলিয়ে দেবারও চেষ্টা করলে সে। হাত মুখ নেড়ে একটু ধমকের সুরেই সুস্মিতাকে বললে—

"আপনি সরে'সরে' বেড়াচ্ছেন কেন, আলাপ করুন না পুরন্দরবাবুর সঙ্গে।"

সুস্মিতা হাসিমুখে এগিয়ে এল একটু। পুরন্দরবাবু যে তাকে দেখতে আসেন নি একথা সে এতক্ষণে বুঝেছিল, তার সঙ্গর চেয়ে পারুলের সঙ্গই যে বেশী পছন্দ করছেন তিনি—এ-ও অস্পষ্ট ছিল না তার কাছে, তবু হাসি-মুখে এগিয়ে গেল একটু সে। পুরন্দরবাবুর কথাবার্ত্তা সম্পূর্ণরূপে বোঝাবার মতো বুদ্ধি ছিল না তার, তবু সে শুনে যাচ্ছিল মুখের হাসিটুকু বজায় রেখে। তার মনে যে কোন দুঃখ হয়েছে তা তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না। সকলের আনন্দের মাঝখানে সে যে থাকতে পেয়েছে এতেই যেন সে চরিতার্থ।

· "তোমার দিদি ভারী চমৎকার লোক, নয়?" পুরন্দরবাবু পারুলকে বললে চুপি চুপি।

"কে দিদি? নিশ্চয়! দিদির মতো মেয়ে আছে! এতো ভালো লাগে দিদিকে" সোচ্ছ্বাসে বলে উঠল পারুল।

বিশ্বম্ভর-গৃহিণী আহারের আয়োজন করেছিলেন সাহেবী-কায়দায়।

বেশ বোঝা গেল যে তাঁদেরই জন্যে বিশেষ আয়োজন এটা। খাওয়ার পর বৈঠকখানায় গিয়ে জমায়েত হলেন সবাই।

আহারান্তে বিশ্বম্ভরবাবু বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন। পুরন্দরবাবুর আলাপ খুব উপভোগ করতে লাগলেন তিনি, তাঁর প্রতি কথায় হাসতে লাগলেন। পুরন্দরবাবুরও প্রাণে যেন জোয়ার এসেছিল। অনুপ্রাসে, অলঙ্কারে, কবিতায়, রসিকতায় মাতিয়ে তুললেন তিনি সবাইকে। যুগল পালিতের আর সহ্য হল না। সেও রবিঠাকুরের দু' লাইন কবিতা আউড়ে দিলে...মেয়ের দল কলস্বরে হেসে উঠল, কারণ কবিতাটা একটু বেমানান হয়ে গেল। "ও মা, যুগলবাবুও কবিতা জানেন তাহলে" বলে উঠল একজন।

বিশ্বম্ভরবাবু ঘাড় ফিরিয়ে হাসিমুখে চাইলেন যুগলের দিকে।

"কি কবিতা—"

তাঁর চতুর্থী কন্যা একমুখ হেসে বললে—"উনি বললেন, আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা?"

"বাসবদত্তা? ও, তার মানে—ও"

কঙ্কনা বললে—"রবি ঠাকুরের 'অভিসার' কবিতাটা—"

"অভিসার? ও—"

বিশ্বম্ভর ভ্রূকুঞ্চিত করলেন একটু।

কঙ্কনা নিম্নকণ্ঠে যুগলকে বললে—"আপনার বরং বলা উচিত ছিল 'নগরীর দীপ নিবেছে পবনে, দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে'—ও কি আপনার চোখে কিছু পড়ল না কি?"

যুগল চোখ কচলাচ্ছিল।

বিশ্বম্ভরবাবু শঙ্কিত হয়ে পড়লেন—"কি হল চোখে?"

"চোখের নীচের পাতাটা ওপরের পাতার তলায় ঢুকিয়ে দিন—"

"হাঁচুন, হাঁচুন—"

ঘাড়ে থাপ্পড় মারুন—"

নানা উপদেশ বর্ষিত হতে লাগল।

"খেয়ে এখন ঘুমুবেন না কি! চলুন বাগানে যাওয়া যাক,—একজন বলে' উঠল।

"আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে"—বিশ্বম্ভরবাবু হাই তুললেন।

"আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে। আমরা এখন হুল্লোড় করব, আপনি কতক্ষণ থাকবেন। আপনি শুয়ে পড়ুন।"

"ও, আচ্ছা।"

"চল, তোমার মশারীটা ফেলে দিই গে—"

স-গৃহিণী বিশ্বম্ভরবাবু ওপরে চলে যেতেই বাগানে নেবে পড়ল আবার সবাই।

যুগল হঠাৎ পুরন্দরবাবুর কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললে "শুনুন একবার—"

একটু দূরে সরে' গিয়ে সে বলে উঠল' "না, দেখুন, মাপ করবেন, এবার আমি কিছুতেই, এবার আমি কিছুতেই—মানে—"

"মানে, কি? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

যুগল আর কিছু বলতে পারলে না—ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল শুধু—জোর করে' হাসবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

"কোথা—কোথা গেলেন আপনারা—আমরা সব 'রেডি'।"

মেয়েদের কলকণ্ঠ শোনা গেল দূরে: পুরন্দরবাবু স্কন্ধদ্বয় উত্তোলন করে' 'শ্রাগ্' করলেন, তারপর মেয়েদের দিকে ফিরে গেলেন। যুগলও ছুটতে লাগল পিছু পিছু।

"নিশ্চয় রুমাল চাইছিলেন আপনার কাছে" কঙ্কনা বললে পুরন্দরবাবুকে—

"গতবার রুমাল আনতে ভুলেছিলেন।"

"প্রতিবারই ভুলবেন উনি" টিপ্পনি কাটলে পারুলের সেজদিদি।

"মা, যুগলবাবু এবারও রুমাল ফেলে এসেছেন, মা যুগলবাবু রুমাল ফেলে এসেছেন" চীৎকার করে' উঠল একসঙ্গে সবাই।

হেমাঙ্গিনী দেবী দ্বিতলের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন—"ও, আচ্ছা, পাঠিয়ে দিচ্ছি" ভিতরে ঢুকে গেলেন তিনি।

"না, না আমার দুটো রুমাল আছে, "চীৎকার করে' উঠল যুগল।

কিন্তু সে কথা হেমাঙ্গিনী দেবী শুনতে পেলেন না, একটু পরেই একটা চাকর একটা রুমাল নিয়ে ছুটতে ছুটতে নেবে এল। হো হো করে' হেসে উঠল সবাই।

"এবার কিন্তু কিম্বদন্তী খেলব আমরা" মেয়েরা সবাই বলে উঠল। একটা জায়গা ঠিক করে' বসে' পড়ল সবাই। কঙ্কনা প্রথমে যাবে ঠিক হল। কঙ্কনা দল ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেল, যেন কিছু শুনতে না পায়। একটা 'কিম্বদন্তী বাছা হল, কিম্বদন্তীর কোন্ কোন্ কথা দিয়ে কে কি বাক্য তৈরি করবে তা ঠিক হল, তারপর ডাকা হল কঙ্কনাকে। কঙ্কনা ঠিক ধরে' ফেললে কিন্তু। প্রবাদটা ছিল—যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই।

এর পর নীল-চশমা-পরা উসকো খুসকো চুল সেই ছোকরাটির পালা। এর সম্বন্ধে সবাই আরও সাবধান হ'ল—একে আরও দূরে ওই বটগাছটার কাছে গিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ছোকরা চটল খুব, কিন্তু যেতেই হল তাকে। ফিরে এসে 'কিম্বদন্তী'টাও সে ধরতে পারলে না। প্রত্যেকের জন্য দু'বার দু'বার শুনলে তবু পারলে না। লজ্জিত হয়ে পড়ল বেচারা। প্রবাদটা ছিল—অতি বড় হ'য়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি ছোট হ'য়ো না ছাগলেতে খাবে।

"বাজে সব" বলে উঠল ছোকরা।

এর পর গেলেন পুরন্দরবাবু, তাঁকে আরও দূরে পাঠানো হ'ল তিনিও হেরে গেলেন।

"বড্ড একঘেয়ে লাগছে" বললে কেউ কেউ।

"আচ্ছা এবার আমি সঙ্গে যাই" পারুল বললে।

"না, যুগলবাবু যাবেন এবার, এবার যুগলবাবুর পালা" সকলে চীৎকার করে' উঠল একযোগে।

১৩

যুগলবাবুকে একেবারে বাগানের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যেতে হল, গিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে' দাঁড়াতে হ'ল একটি কোনে এবং যাতে ঘাড় ফিরিয়ে এদের দিকে না তাকায় তার জন্যে কটা-চুল সেই মেয়েটিকে পাহারা পাঠানো হল। যুগল সামলে নিয়েছিল এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল ওদের মতো করে' ওদের আনন্দে যোগ দিতে। সুতরাং সে অনড় হয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কটাচুল মেয়েটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে দিতে আর সকলের সঙ্গে ইসারায় ইঙ্গিতে বলতে লাগল কি যেন সব। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিল এইবার মজার কিছু একটা হবে, ষড়যন্ত্র চলছে একটা। হঠাৎ কটাচুল মেয়েটি হাত নাড়তেই সবাই উঠে পালিয়ে গেল ঊর্দ্ধশ্বাসে।

"চলুন, চলুন আপনিও আসুন" অনেকে চুপি চুপি বললে পুরন্দরবাবুকে।

"কেন, ব্যাপার কি—"

"আঃ চেঁচাবেন না। উনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন না যতক্ষণ পারেন, আমরা পালাই চলুন। শিমুল আসছে ওই দেখুন" কটা-চুল মেয়েটিও ছুটে পালিয়ে এল নিঃশব্দে! সকলে ছুটে পুকুরের ওধারে চলে গেল। অর্থাৎ যুগল যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে অনেক দূরে বিপরীত দিকে একেবারে। পুরন্দরবাবু সেখানে গিয়ে দেখলেন সুমিতা খুব রাগ করে' কঙ্কনা আর পারুলকে বকছে খুব।

"রাগ কোরো না দিদি, লক্ষ্মীটি"—পারুল ভোলাবার চেষ্টা করছে তাকে।

"আচ্ছা বেশ, মা-কে আমি বলব না, কিন্তু আমি আর থাকছি না এখানে। ভদ্রলোককে দেওয়ালের ধারে দাঁড় করিয়ে এমনভাবে পালিয়ে আসাটা কি ভদ্রতা! কি মনে করবেন ভদ্রলোক, ছি, ছি, ছি।"

সুস্মিতা চলে গেল। সুস্মিতা যুগলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু আর কেউ হল না, বরং আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল সবাই। ঠিক হ'ল যুগল ফিরে এলে কেউ যেন তাকে লক্ষ্য না করে। পুরন্দরবাবুও না।

"আসুন কানামাছি খেলা যাক"—কটাচুল মেয়েটি বললে।

মিনিট পনের পরে যুগল ফিরে এল। সত্যি অনেকক্ষণ সে দেওয়ালের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। কানামাছি খেলা খুব জমে উঠেছে, চীৎকার হাসি হুল্লোড়ে মেতে উঠেছে সবাই। যুগল রাগে কাঁপতে কাঁপতে সোজা চলে গেল পুরন্দরবাবুর কাছে। তাঁর কামিজের হাতাটায় টান দিয়ে বললে—"শুনুন একবার।"

"কি মুশকিল, বার বার কত শুনবেন উনি আপনার কথা। আবার রুমাল চাই নাকি?"

যুগল পুরন্দরবাবুকে টেনে নিয়ে গেল একধারে।

"এবার নিশ্চয় আপনি, মানে আপনি ছাড়া—"

যুগলের দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠল।

পুরন্দরবাবু শান্তকণ্ঠে বললেন—"ওরকম করবেন না আপনি, তাহলে ওরা আরও ক্ষেপে যাবে। আপনি চটছেন বলেই না ওরা চটাচ্ছে আপনাকে। বেশ সহজভাবে মিশুন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

পুরন্দরবাবুর কথাগুলো যুগলের প্রাণে লাগল মনে হল, সে আর কোন উচ্চবাচ্য না করে' দলের মধ্যে ফিরে গিয়ে কানামাছি খেলায় যোগ দিলে, যেন কিছু হয় নি। মেয়েরাও আর তাকে বিশেষ বললে না কিছু। বিশ্বাসহন্ত্রী শিমুলের (কটা-চুল মেয়েটির) সঙ্গেও সে বেশ সহজভাবে মেশবার চেষ্টা করতে লাগল। পুরন্দরবাবু এটা কিন্তু লক্ষ্য করলেন যে যুগল পারুলের

সঙ্গে কথা কইতে সাহস করছে না, যদিও তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোঁক ছোঁক করে'। মনে হ'ল পারুলের ঘৃণা এবং অবজ্ঞাটা সে যেন তার প্রাপ্য বলেই মেনে নিয়েছে—এ নিয়ে প্রতিবাদ করার সাহস বা সামর্থ্য কোনটাই তার আর নেই যেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও আবার তারা শেষকালে তাকে আর একটা খোঁচা দিতে ছাড়লে না।

লুকোচুরি খেলা হচ্ছিল। যুগল একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে ছিল। তারপর তার কি মনে হল সে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটা ঘরে গিয়ে আলমারির পিছনে লুকোল। দেখতে পেয়ে গেল সবাই সেখা! শিমুল তার পিছু পিছু গিয়ে আস্তে আস্তে ঘরটায় শিকল তুলে দিয়ে পালিয়ে এল। তারপর সবাই চলে গেল আবার সেই বটগাছটার দিকে। যুগল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে যখন দেখল কেউ তাকে খুঁজতে আসছে না, তখন সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল। কাছে-পিঠে কাউকে দেখতে পেলে না। কপাট খুলতে গিয়ে দেখে কপাট বাইরে থেকে বন্ধ! চীৎকার করবার উপায় নেই—বিশ্বম্ভরবাবুর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। কাছে-পিঠে চাকরবাকরও দেখতে পাওয়া গেল না একটিও। স্মিতাও ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সুতরাং বেচারাকে বন্দী হয়েই বসে থাকতে হল খানিকক্ষণ। অনেকক্ষণ পরে এ'কে একে ফিরে এল সব।

যুগলবাবু আপনি এখানে বসে' কি করছেন? কি মজা হল এতক্ষণ। আমরা থিয়েটার থিয়েটার খেলছিলাম। পুরন্দরবাবু কি চমৎকার বক্তৃতা দিলেন! যুবকের পার্ট করলেন, এমন সুন্দর হয়েছিল।

"আপনি বসে' আছেন কেন? আসুন আপনাকে দেখেও মুগ্ধ হওয়া যাক একটু।"

"এখনও খেলা শেষ হয় নি নাকি?" হেমাঙ্গিনী দেবীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, বাগানে বসে' মেয়েদের সঙ্গে চা খাবেন বলে' বেরিয়ে এলেন তিনি।

"কি হচ্ছে সব ?"

"দেখুন না, যুগলবাবু ওপরে বসে আছেন"—মেয়েরা আঙুল দিয়ে যুগলবাবুকে দেখিয়ে দিলে। রেগে টং হয়ে' গিয়ে তিনি জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন।

"তোমাদের সঙ্গে সমানে দাপাদাপি করতে কে পারে বল ?"

হেসে তিনি চাইলেন যুগলের দিকে। যুগলও হাসবার চেষ্টা করলে একটু। পুরন্দরবাবু আসাতে পারুল বিশেষ করে' কেন যে খুশী হয়েছে তা একটু পরে সে নিজেই প্রকাশ করলে পুরন্দরবাবুর কাছে—অবশ্য গোপনে।

কঙ্কনা পুরন্দরবাবুকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। পারুল সেখানে অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। পুরন্দরবাবুকে পারুলের কাছে রেখে কঙ্কনা চলে গেল।

পারুল তাঁকে বললে—"আমার একটি উপকার করবেন ? আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না, সেইজন্যে আপনি আসাতে বিশেষ করে' খুশী হয়েছি আমি।"

"কি উপকার ?"

"যুগলবাবু যতই বলুন আপনি যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু নন তা আমার বুঝতে বাকী নেই। আপনি একটি কাজ করুন দয়া করে', এইটি ফেরত নিয়ে যান, ওঁকে দিয়ে দেবেন কোন সময়ে। আমিও ওঁকে দিতে পারতুম, কিন্তু আমি আর জীবনে ওঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চাই না। আপনি একথাও জানিয়ে দিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলে' দেবেন ভবিষ্যতে উনি যেন জোর করে' কোন উপহার দিতে না আসেন কিম্বা আমার সঙ্গে মেশবার চেষ্টা না করেন। করলে অপমানিত হবেন শুধু। এই উপকারটি আমার করবেন ?"

ব্রেসলেটের বাক্সটা আঁচলের তলা থেকে বার করলে পারুল।

"আমাকে আর এর মধ্যে জড়িয়ো না, দোহাই" পুরন্দরবাবু সকাতরে বললেন।

"জড়াব না? কেন? আচ্ছা বেশ! বেশী করতে হবে না কিছু আপনাকে—"

হঠাৎ পারুলের গলা কেঁপে গেল, ঠোঁট ফুলে উঠল, জল এসে পড়ল চোখে। পুরন্দরবাবু বিব্রত হয়ে পড়লেন।

"না, না, আমি তা বলছি না—আচ্ছা দাও দাও—আমারও একটা বোঝাপড়া আছে ওর সঙ্গে।"

"আমি জানি আপনার সঙ্গে ওর ভাব নেই" সুর বদলে গেল পারুলের, "হতেই পারে না ওরকম লোকের সঙ্গে ভাব। উনি এসেছেন আমাকে বিয়ে করতে! আস্পর্দ্ধা কম নয়। আপনি আজই ফিরিয়ে দেবেন এটা, কেমন? এ নিয়ে বাবার কাছে যদি কাঁদুনি গাইতে যান উনি, মজাটা দেখিয়ে দেব তাহলে।"

হঠাৎ পিছনের ঝোপটা থেকে নীল-চশমা-পরা সেই ছোকরা বেরিয়ে এল। "ওটা ফিরিয়ে দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য"—ছোকরা বললে—"বুঝলেন, মানে নারীদের প্রতি কিছুমাত্র সম্মানবোধ থাকলে এরকম জবরদস্তির প্রতিবাদ করা প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই কর্ত্তব্য" কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই পারুল হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

"মা গো মা! কি আক্কেল তোমার অজিত। স'রে যাও এখান থেকে! আড়ি পেতে কথা শুনতে লজ্জা করে না? তোমাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললাম—এ কি কাণ্ড—যাও এখান থেকে।"

পা ঠুকে এক ধমক দিতেই অজিত সরে' পড়ল। তবু পারুলের রাগ যায় না। রাগে গরগর করতে লাগল সে।

"এমন জালাতন করে এরা" হঠাৎ পুরন্দরের দিকে ফিরে সে বললে "আপনি বুঝবেন না ঠিক। ভারী অবুঝ সব। আপনার হয়তো মজা লাগছে, কিন্তু এমন লজ্জা করে' আমার—"

"একেই বিয়ে করবে ঠিক করেছ না কি" হেসে পুরন্দরবাবু জিগ্যেস করলেন।

"কক্খনো না! একে? আচ্ছা, কি করে ভাবতে পারলেন আপনি!'

হঠাৎ লজ্জায় চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল তার: এ তার বন্ধু একজন। কি রকম অদ্ভুত সব বন্ধু দেখুন তো···বন্ধুত্ব করবার লোক পায় নি আর। দেখুন, আপনাকে ছাড়া আর কাউকে আমি এ কথা বলতে পারি না—এটা ফিরিয়ে দেবেন তো?"

"বেশ দেব।"

"বড্ড ভাল লোক আপনি, খুব ভাল লোক।"

দুচোখে আলো ঝলমল করে' উঠল তার। বাক্সটা পুরন্দরবাবুকে দিয়ে বললে—"আজ অনেক গান গেয়ে শোনাব আপনাকে। অনেক—অনেক। সত্যি খুব ভাল গাইতে পারি আমি, জানেন? তখন মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আবার আসবেন ত? আর একবার অন্তত আপনাকে আসতেই হবে—খুব খুশী হব তাহলে। আপনাকে সব কথা বলব পরে—সমস্ত খুলে বলব। আর কাউকে বলবেন না যেন—"

মুচকি হেসে ভুরু নাচিয়ে ছুটে চলে গেল সে।

পারুল তার কথা রেখেছিল, চা খাবার সময় দুটো গান তাঁকে শুনিয়েছিল। সুন্দর মিষ্টি চড়া গলা। চা খাবার জন্যে ভিতরে এসে পুরন্দরবাবু দেখলেন যুগল গম্ভীরভাবে বিশ্বম্ভরবাবু ও হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে বসে কি কথা কইছে—হয়তো বিবাহপ্রসঙ্গেই আলোচনাটা সে শেষ করছে। দু'দিন পরে তো তাকে চলে যেতে হবে ন'মাসের জন্য। সবাই যখন ঢুকল সে কারও দিকে ফিরে তাকাল না, পুরন্দরবাবুর দিক থেকে বিশেষ করে' মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

কিন্তু পারুল গান আরম্ভ করতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পারুলকে একটা কি জিগ্যেস করলে একটু হেসে, পারুল কোন উত্তর দিলে না। এতে কিন্তু এতটুকু দমল না যুগল, কিছুমাত্র ইতস্তত না করে' এমনভাবে সে সোজা গিয়ে পারুলের চেয়ারের পিছনে দাঁড়াল যেন ন্যায়তঃ ওইটেই তার স্থান এবং কোন কারণেই সেখান থেকে সে একচুল নড়বে না।

পারুলের গান শেষ হয়ে গেলে সে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে বললে—"আপনি একটা গান করুন না,"

"আগে গাইতাম, অনেকদিন গাই নি। আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে—"

পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসলেন তিনি।

"মা, পুরন্দরবাবু গান গাইছেন" মেয়েরা আনন্দে কলরব করে' উঠল। কর্ত্তা গিন্নি বারান্দা থেকে ভিতরে এসে বসলেন। পুরন্দরবাবু রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা ধরলেন—

মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী
সখী, জাগো জাগো

পারুল তাঁর কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে চেয়ে চেয়েই তিনি আবেগভরে গাইতে লাগলেন। আগেকার মতো গলা আর ছিল না, কিন্তু যা ছিল তাইতেই মাত করে' দিলেন। সমস্ত প্রাণ ঢেলে গাইছিলেন তিনি—অন্তরের কামনা যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠতে লাগল প্রতি ছত্রে ছত্রে। প্রতি কথায় ফুটে উঠতে লাগল আকুতিময় আবেগ, মর্ম্মের আবেদন, বাসনার হৃদ্‌স্পন্দন। প্রদীপ্ত চোখে পারুলের দিকে চাইতে চাইতে তিনি গাইতে লাগলেন

জাগো আকুল ফুল সাজে
জাগো মৃদু কম্পিত লাজে
মম হৃদয়-শয়ন মাঝে
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি
সখী জাগো জাগো।

পারুলের সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ জাগল, ভয়ে একটু পিছিয়ে গেল সে, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল এবং সেই মুহূর্ত্তে পুরন্দরবাবুর মনে হল তার চোখে যেন সলজ্জ আমন্ত্রণের একটা আভাস দেখতে পেলেন তিনি। অন্য শ্রোতারাও মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। গান থেমে যাবার পর একটা নিবিড় স্তব্ধতা

যেন ঘনিয়ে এল ক্ষণকালের জন্য—সবাই যেন রুদ্ধশ্বাসে একটা কিসের প্রতীক্ষা করতে লাগল। পুরন্দরবাবু হঠাৎ লক্ষ্য করলেন সুমিতার চোখ দুটো যেন জ্বল জ্বল করছে।

বিশ্বম্ভরবাবু নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

"গানটা বেশ, কিন্তু একটু, ওর নাম কি, যাকে বলে" গলা খাঁকারি দিয়ে থেমে গেলেন ভদ্রলোক। রবিঠাকুরের গানের বিরুদ্ধে কিছু বলবার সাহস সংগ্রহ করতে পারলেন না তিনি।

"পুরন্দরবাবুর গলা তো চমৎকার" হেমাঙ্গিনী দেবী সুরু করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু যুগল তাঁকে কথা শেষ করতে দিলে না। সে এক কাণ্ড করে' বসল। হঠাৎ ছুটে গিয়ে পারুলের হাত ধরে হিড় হিড় করে' তাকে পুরন্দরবাবুর কাছ থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে এল, তারপর পুরন্দরবাবুর কাছে গিয়ে বললে—

"এক মিনিট, বাইরে চলুন তো একবার।"

ঠোঁট দুটো কাঁপছিল তার।

পুরন্দরবাবু দেখলেন বাইরে না গেলে এখনই হয়তো সে যা তা একটা কাণ্ড করে' বসবে। তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন।

"আপনাকে এখনই এই মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে চলে যেতে হবে, বুঝলেন ?"

"কেন ? বুঝতে পারছি না ঠিক।"

উত্তেজিত কণ্ঠে যুগল বলতে লাগল, "মনে আছে, আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলতে বলেছিলেন তখন আমি বলিনি, সময় হলে বলব বলেছিলাম ; এখন সময় হয়েছে, বুঝলেন, চলুন যাই। আর এখানে থাকা চলবে না।"

পুরন্দরবাবু ক্ষণকাল ভাবলেন, যুগলের মুখের দিকে চাইলেন একবার, তারপর রাজি হয়ে গেলেন।

"আচ্ছা বেশ, চলুন তবে।"

হঠাৎ চলে যাওয়ার প্রস্তাবে কর্ত্তাগিন্নি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন, মেয়েরা আপত্তি করতে লাগল।

"আর এক কাপ করে' চা খেয়ে যান অন্তত" হেমাঙ্গিনী দেবী অনুরোধ করলেন।

"যুগল একধারে মুখ কালো করে' দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বম্ভরবাবু তার কাছে গিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে প্রশ্ন করলেন, "হঠাৎ হ'ল কি ?"

"যুগলবাবু, কেন আপনি পুরন্দরবাবুকে নিয়ে যাচ্ছেন" মেয়েরা অনেকেই ক্ষুন্নকণ্ঠে প্রশ্ন করতে লাগল। পারুল যুগলবাবুর দিকে এমন একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে যে সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল, কিন্তু গোঁ ছাড়লে না।

পুরন্দরবাবু হেসে বললেন, যুগলবাবুর দোষ নেই। আমারই জরুরি একটা এনগেজমেণ্ট আছে এখন—আমি ভুলে গিয়েছিলাম—যুগলবাবু মনে করিয়ে দিলেন সেটা। আমাকে যেতেই হবে।"

পুরন্দরবাবু হাসিমুখে প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। সুমিতাকে নমস্কার করলেন বিশেষ করে'।

"আপনি আসাতে ভারী আনন্দে কাটল দিনটা। আবার আসবেন" বিশ্বম্ভরবাবু বললেন ভদ্রতা করে'।

"এলে সত্যিই ভারী খুশি হব" হেমাঙ্গিনী দেবীও বললেন হেসে।

"পুরন্দরবাবু, আবার কবে আসবেন"—মেয়েরা অনেকে বলে উঠল।

গাড়ীতে যখন চড়েছেন তখন একটি কণ্ঠস্বরে একটা বিশেষ মিনতি যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল—পুরন্দরবাবুর মনে হল।

"আসবেন আবার পুরন্দরবাবু, লক্ষ্মীটি—আসবেন নিশ্চয়।"

পুরন্দরবাবু মুখ বাড়িয়ে দেখলেন সেই কটা-চুল মেয়েটি।

১৪

কটা-চুল মেয়েটির মুখখানা বার বার মনে পড়তে লাগল, কিন্তু তবু পুরন্দরবাবুর মনের অন্ধকার যেন ঘুচল না। সমস্ত দিনটা যদিও হল্লা করেই কেটেছে—খেলা, হাসি, গান, অতগুলি মেয়ের সঙ্গ—অন্তরের গ্লানি কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যেও অপসারিত হয় নি মন থেকে। গান গাইবার লোভটা কিছুতেই দমন করতে পারলেন না তিনি এবং সেই জন্যেই বোধহয় অত আবেগভরে গাইলেন।

"ছি ছি কি কাণ্ডটাই করলাম—এমনভাবে চলে আসাটা" মনে মনে আফশোষ হচ্ছিল কিন্তু তখনই নিজেকে সম্বরণ করলেন। অনুতাপ করাটা আত্মসম্মানহানিকর বলে' মনে হতে লাগল—তার চেয়ে বরং রাগ করা ঢের ভাল।

"গাড়োল!" যুগলের দিকে আড়চোখে চেয়ে মনে মনে বললেন তিনি।

যুগল নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল। একটি কথাও বলে নি—যা বলবে তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল বোধহয়। মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে ঘাড় মুখ মুছছিল। "ঘামছে ব্যাটা"—পুরন্দরবাবু স্বগতোক্তি করলেন।

একবার শুধু যুগল গাড়োয়ানকে জিগ্যেস করলে—"ঝড়টড় করবে না কি, মেঘ করেছে দেখছি—"

"উঠবে ঠিক। যা গুমোট করেছে সমস্ত দিন।"

ঈশান কোণে সত্যিই মেঘ উঠেছিল, একটা বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

বাড়ি পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেল।

"আমি আপনার বাসাতেই যাব এখন কিন্তু" যুগল আগে থাকতে বলেই রেখেছিল।

"আসতে পারেন, কিন্তু আমার শরীরটা ভাল নেই।"

"আমি বেশীক্ষণ থাকব না।"

গাড়ি থেকে নেবেই যুগল চাকরটার খোঁজ করতে ভিতরে ঢুকে গেল।

"কেন, চাকর কি করবে এখন ?"

যুগল কোন উত্তর দিলে না। পুরন্দরবাবু আলো জ্বালতেই যুগল চেয়ারে বসল। পুরন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে' তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনের বিরক্তি যথাসাধ্য গোপন করে' শেষে বললেন—"দেখুন, সব কথা আমি জানতে চেয়েছিলাম বটে, কিন্তু আর আমার কিছু জানবার প্রবৃত্তি নেই। আমাদের মধ্যে জানাজানির আর কোন প্রয়োজন আছে বলে'ই মনে হচ্ছে না। সুতরাং আপনি এখন বাড়ি যান, আমি খিল বন্ধ করে শুয়ে পড়ি। রাত হয়ে গেছে।"

"আমাদের মধ্যে বোঝাপড়াটা কিন্তু হওয়া দরকার যে" পুরন্দরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে যুগল বেশ শান্তভাবেই কথাগুলো বললে।

"বোঝাপড়া! কিসের বোঝাপড়া? এই বলবার জন্যে আপনি ডেকে নিয়ে এলেন আমাকে ?"

'হ্যাঁ—এই।"

"বোঝাপড়া করবার কিছু নেই তো—বোঝাপড়া অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে।"

"ও, তাই না কি" বলে যুগল চুপ করে' গেল।

পুরন্দরবাবুও কোন উত্তর না দিয়ে পরিক্রমণ সুরু করলেন। পাপিয়ার মুখখানা মনে পড়ছিল বারবার। অনেকক্ষণ নীরবতার পর হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন—"কি বোঝাপড়া করতে চান আপনি ?"

যুগল চেয়ে চেয়ে দেখছিল তাঁকে এতক্ষণ।

"আর ওখানে আপনি যাবেন না" সহসা করুণ কণ্ঠে বলে' উঠল সে এবং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"ও, আপনি ওই সব ভাবছেন নাকি" পুরন্দরবাবু হেসে ফেললেন, "আচ্ছা, আজ সমস্ত দিন আপনি কি কাণ্ডটা করলেন বলুন দেখি" খুব একটা উপদেশাত্মক বক্তৃতার সুরে আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ সুরটা বদলে অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—"আজ আমিও নিজেকে যতটা হীন করেছি এতটা হীন বোধহয় জীবনে কখনও করি নি—প্রথমত আপনার সঙ্গে যেতে রাজি হ'য়ে—দ্বিতীয়ত ওখানে ওদের সঙ্গে যা হ'ল···এত ছেলেমানুষি যা তা কাণ্ড সব···নিজেকে ওসবের সঙ্গে জড়িয়ে লজ্জা হচ্ছে আমার...ছি ছি... আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল...আর আপনিও যে কাণ্ডটা করলেন তা কি কোন ভদ্রলোক করে'—আমাকে অমনভাবে অপ্রস্তুত করবার মানে কি—কিন্তু আপনাকে কিছু বলছি না আমি সে জন্যে—আমার দুর্বুদ্ধির জন্যে শাস্তি পাওয়া উচিত—ভয় নেই আমি আর যাব না সেখানে...ওদের সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই আমার।"

সদম্ভে বক্তব্য শেষ করলেন তিনি।

"সত্যি? সত্যি বলছেন?" যুগল তার আনন্দ যেন আর চাপতে পারছিল না। পুরন্দরবাবু তার দিকে ঘৃণাব্যঞ্জক একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' আবার পদচারণা সুরু করলেন।

"আপনি তাহলে আবার বিয়ে করে' সুখী হবেন ঠিক করে' ফেলেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তাতে আমার কি" পুরন্দরবাবু ভাবছিলেন," ও যদি বোকামি করে' উচ্ছন্ন যায় আমার কি এসে যায় তাতে! আমি বড় জোর ঘৃণা করতে পারি, যদিও ঘৃণারও উপযুক্ত ও নয়।"

"স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করাই তো আমার কাজ" কাচুমাচু হ'য়ে

একটু হেসে যুগল বললে, "আপনিই তো একথা বলেছিলেন একদিন। আপনার একটি কথাও ভুলি না আমি, যা বলেন সব মনে থাকে।"

এক বোতল মদ এবং দুটো গ্লাস নিয়ে চাকরটা ঘরে ঢুকল।

"ও ওই জন্যেই চাকরের খোঁজ হচ্ছিল! এখন আপনাকে মদ খেতে দেব না আমি—"

"মাপ করবেন পুরন্দরবাবু, না খেলে পারব না আমি। আমাকে ছোটলোক বলে' ভাবুন ক্ষতি নেই—কিন্তু খেতে দিন আমাকে।"

"আমার শরীর ভাল নেই, এখন আমি শুতে যাই।"

"হ্যাঁ এই যে—এখনি এখনি—গলাটা ভিজিয়ে নি শুধু একটু।"

তাড়াতাড়ি সে আধ গ্লাসটাক খেয়ে ফেলে ঢোঁ করে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই, বাকী অৰ্দ্ধেকটা শেষ করলে বসে'। তারপর সস্নেহে চাইলে সে পুরন্দরবাবুর দিকে। চাকরটা বেরিয়ে গেল।

"আঃ—" পুরন্দরবাবু অস্ফুট কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

"দেখুন, ওর মেয়ে-বন্ধুগুলোই ওকে" যুগল বাগিয়ে সুরু করল আবার!

"কি? ও, তাদের কথাই ভাবছেন এখনও!"

"ওর মেয়ে-বন্ধুগুলোই ভাংচি দিচ্ছে। ওর বয়সই বা কি...তা ছাড়া মেয়েদের একটু আধটু আদিখ্যেতা তো থাকবেই। ভারী চমৎকার! আমি কেনা গোলাম হয়ে থাকব ওর! তবু মন পাব না বলছেন? গাড়ি, বাড়ি, গয়না, সামাজিক সম্মান এসব পেলেও বদলাবে না? নিশ্চয় বদলাবে।"

"ওকে ব্রেসলেট্ জোড়া ফেরত দিতে হবে মনে পড়ল পুরন্দরবাবুর! ভ্রূকুঞ্চিত করে' পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন সেটা আছে কিনা।

"আপনি বলছেন আমি সুখী হব ঠিক করেছি কি না? না ঠিক করে উপায় কি! আর বিয়ে না করলে সুখী হবই বা কি করে! বলুন, আপনিই বলুন"—করুণকণ্ঠে বলতে লাগল সে—"আমার গতি কি হবে, তাহলে ভেবে দেখুন"—বোতলটা দেখিয়ে বললে—"এতেই ডুবে যেতে হবে শেষে, কিন্তু

এ তো কিছু নয়, যে নরক আমাকে টানছে তার শতাংশের একাংশও নয়। বিয়ে করে' ভদ্র একটা জীবনকে যদি আঁকড়ে ধরতে না পারি তাহলে ডুবে যাব আমি। নূতন একটা আদর্শ পেলেই ঠেলে উঠব আবার দেখবেন।"

"কিন্তু এসব কথা আপনি আমাকে বলছেন কেন শুধু শুধু" বলেই পুরন্দরবাবু হেসে ফেললেন। তার পর বললেন, "আচ্ছা আমাকে ওখানে টেনে নিয়ে গেলেন কেন আপনি! উদ্দেশ্যটা কি ছিল আপনার?"

"পরখ করা..." বলেই বুগল বিব্রত হয়ে পড়ল।

"কি পরখ করা?"

"ফলাফলটা।...মানে, এই হপ্তাখানেক থেকে ওখানে যাচ্ছি তো," একটু বিব্রত হয়ে পড়ল সে—"আপনাকে দেখে সেদিন হঠাৎ মনে হল পর-পুরুষের সঙ্গে ও কি রকম ব্যবহার করে' তা তো জানা নেই! পরীক্ষা করে' দেখলে হয় একদিন। বোকামি আর কি। কোন দরকার ছিল না। অত্যন্ত বেশী আশা করে ছিলাম...আমার চরিত্র এমনই—কি আর বলব বলুন...মানে—"

হঠাৎ মুখ তুলে চাইলে সে। পুরন্দরবাবু দেখলেন—চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে তার।

"সত্যি কথা বলছে তো" পুরন্দরবাবু ভাবলেন এবং মনে মনে চিন্তিত হ'য়ে গেলেন—

"বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা ভাল করে'—"

"ছেলেমানুষি আর কি! তাছাড়া ওর ওই মেয়ে বন্ধুগুলো! ঝোঁকের মাথায় আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে' ফেলেছি, মাপ করবেন। আর কখনও এমন হবে না।"

"আমি সেখানে আর যাবই না।"

"হ্যাঁ, সেইজন্যেই আশা করছি যে এ রকমটা আর কখনও ঘটবে না।"

পুরন্দরবাবু হেসে বললেন—"কিন্তু আমি ছাড়া আরও পুরুষ আছে তো সংসারে—তাদের সামলাবেন কি করে?"

যুগলের মুখ লাল হয়ে উঠল।

"আপনার মুখে একথা শুনে দুঃখিত হলাম পুরন্দরবাবু। পারুলের সম্বন্ধে আমার ধারণা মোটেই হীন নয়।"

"ক্ষমা করবেন, আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম। একটা ব্যাপারে খুব আশ্চর্য্য লাগছে কিন্তু। আমার আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে আপনার ধারণা যেমন প্রচণ্ড, আমার চরিত্রের ওপর আপনার বিশ্বাসও তেমনি অগাধ দেখছি।"

হ্যাঁ ঠিকই তাই...অতীতে এর প্রমাণ পেয়েছি যে—"

"আপনি এখনও তাহলে আমাকে একজন চরিত্রবান পুরুষ বলে' মনে করেন!"

অন্য সময়ে নিজের এ প্রশ্নে নিজেই চমকে উঠতেন পুরন্দরবাবু।

"আমি বরাবরই তাই ভেবেছি আপনাকে"—চোখ নীচু করে' যুগল বললে।

"হ্যাঁ, তাতো ঠিকই—তা আমি বলছি না,—আমি বলছিলাম যে অতীতে আমার সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তা এখনও—মানে—"

"হ্যাঁ এখনও তা ঠিক আছে।"

"আপনি এবার যখন কোলকাতায় এসেছিলেন তখনও আমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা ছিল আপনার?"

পুরন্দরবাবু কৌতুহল দমন করতে পারলেন না কিছুতেই।

"হ্যাঁ। আমি বরাবরই আপনাকে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলেই জানি।"

যুগল চোখ তুলে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে চাইলে পুরন্দরবাবুর দিকে। পুরন্দরবাবুই ভয় পেয়ে গেলেন হঠাৎ—কিছু একটা হয়ে পড়ুক এ তিনি চান না—যে ভদ্র আবরণটা দু'জনের মধ্যে এখনও আছে তা সরিয়ে দেবার

যোটে ইচ্ছে নেই তাঁর। ভয়ে হ'তে লাগল আবরণটা খসে' পড়ে বুঝি!

"আমি আপনাকে ভালবাসতাম পুরন্দরবাবু" যেন এইবার সমস্ত খুলে বলবে এই রকম একটা ভাব করে' যুগল সুরু করলে "বর্দ্ধমানে যখন ছিলেন আপনি, সত্যিই আমি আপনাকে ভালবাসতাম। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেন নি।"

যুগলের গলা কাঁপতে লাগল, পুরন্দরবাবুর আরও ভয় হ'ল—"আপনার তুলনায় সত্যিই নগণ্য ছিলাম আমি, লক্ষ্য করবার কথাও নয়। তাছাড়া প্রয়োজনও ছিল না কোন। গত ন বছর আপনার কথা কিন্তু বার বার মনে পড়েছে আমার, কারণ আমার জীবনে ওই বছরটাই সব চেয়ে সুখের ছিল। ওর চেয়ে ভাল সময় আর আসে নি" (যুগলের চোখ দুটো চক চক করতে লাগল) "আপনার অনেক রসিকতা, অনেক কবিতার লাইন, অনেক জিনিস মনে পড়ত আমার। আপনি যে একজন উদার-হৃদয় শিক্ষিত ব্যক্তি—শুধু শিক্ষিত নয়, উচ্চশিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তি—এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না—আপনিই একবার বলেছিলেন—"মহৎ প্রেরণার উৎস মহৎ প্রতিভা নয়, মহৎ হৃদয়"—আপনি হয়তো ভুলে গেছেন—কিন্তু আমি ভুলি নি। আপনারও হৃদয় যে মহৎ সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলাম আমি তাই সমস্ত সত্ত্বেও আপনার উপর বিশ্বাস হারাই নি।"

হঠাৎ তার থুতনিটা কাঁপতে লাগল। পুরন্দরবাবু অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। যেমন করে' হোক কথার মোড়টা ফেরাতে হবে। কিন্তু সহসা নিজেই সংযম হারিয়ে ফেললেন তিনি।

"থাক থাক হয়েছে হয়েছে, কি বকছেন যা তা" এই কথা বলতে বলতেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন "এ সব কথা বলবার মানে কি—বারবার বলছি শরীর ভাল নেই আমার—তবু আপনি ক্রমাগত ভ্যান ভ্যান করে' বকেই চলেছেন—বকে' বকে' আমাকে উন্মাদ প্রায় করে তুলেছেন, তবু আপনার তৃপ্তি হচ্ছে না—ইঙ্গিতে ইশারায় ঠারে ঠোরে এক অজানা অন্ধকারে ক্রমাগত

ঠেলে নিয়ে চলেছেন আমাকে—অথচ সব মিথ্যে, ধাপ্পাবাজি, জুয়োচুরি বাড়াবাড়ি—এইটেই সব চেয়ে মারাত্মক—বাড়াবাড়ি—বাড়াবাড়ি। একটুও সত্যি নয়—সব বাজে মিথ্যে কথা। দুজনেই সমান পাজি আমরা, দুজনেই অন্ধকারের ঘৃণ্য জীব। একটুও ভালবাসেন না আপনি আমাকে, সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করেন—বলেন তো এখুনি প্রমাণ করিয়ে দিতে পারি সে কথা। আপনি মিছে কথা বলছেন। আপনি যে আমাকে আজ ওখানে জোর করে' টেনে নিয়ে গেলেন তা আপনার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর সতীত্ব পরীক্ষ করবার জন্যে নয়—বাঁকা পথে প্রতিশোধ নেবার জন্যে। ওই মেয়েটাকে দেখিয়ে আমার হিংসা প্রবৃত্তিটাকে উত্তেজিত করে আপনি উপভোগ করতে চাইছিলেন সেটা—"দেখেছেন কি রকম খাসা মেয়ে জোগাড় করেছি এবার। আমারই হবে ও। কি করতে পারেন এবার করুন"—এই ছিল আপনার মনোভাব! আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন আমাকে। ঘৃণা না করলে কেউ কাউকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে না, সুতরাং আপনি যে আমাকে ঘৃণাই করেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার।"

চীৎকার করতে করতে সমস্ত ঘরে যেন ছুটোছুটি করতে লাগলেন তিনি। আত্মসংযম হারিয়ে যুগলের কাছে নিজেকে যে এমনভাবে হীন করে' ফেললেন এই ভেবে অত্যন্ত খারাপও লাগছিল তাঁর কিন্তু সামলাতে পারছিলেন না নিজেকে।

"আপনার সঙ্গে মিটমাট করে' ফেলাই উদ্দেশ্য ছিল আমার পুরন্দরবাবু!"

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে যুগল বলে' উঠল হঠাৎ তার থুত্‌নিটা কাঁপতে লাগল।

ভয়ঙ্কর রাগ হল পুরন্দরবাবুর—তাঁর মনে হল এত অপমান বুঝি তাঁকে জীবনে কেউ কখনও করে নি।

"আবার আমি আপনাকে বলছি আমার শরীর ভাল নেই—এমন করে' লাগবেন না আমার পিছু। আপনি কেন লাগছেন তাও জানি, আপনি

আশা করছেন যে আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলে একটা ভয়ঙ্কর স্বীকারোক্তি বার করে' নেবেন আমার মুখ থেকে। কিন্তু জেনে রাখুন ভিন্ন জগতের লোক আমরা এবং...এবং আমাদের দুজনের মাঝখানে একটা চিতা প্রসারিত রয়েছে" —হঠাৎ বলে' ফেললেন তিনি এবং বলেই বুঝলেন কি করে' ফেলেছেন।

"আপনি জানেন" হঠাৎ যুগলের মুখখানা বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে গেল— "আপনি জানেন আমার কাছে সে চিতার অর্থ কি—"

হাস্যকর অথচ ভয়ঙ্কর একটা ভঙ্গীতে পুরন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজের বুক চাপড়ে সে বলে উঠল "এইখানে জলছে সে চিতা, আমরা দুজনেই সে চিতার ধারে দাঁড়িয়ে আছি তা ঠিক, কিন্তু আমার দিকেই আঁচটা লাগছে বেশী"—পাগলের মতো বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগল—"অনেক বেশী, অনেক বেশী —"

হঠাৎ অত্যন্ত জোরে ইলেকট্রিক ঘণ্টাটা বেজে ওঠাতে দুজনেই প্রকৃতিস্থ হল। এত জোরে বাজতে লাগল যেন কেউ ঘণ্টাটা ভেঙে ফেলতে চায়।

"কে এলো ? আমার কাছে যারা আসে তারা কখনও এত জোরে ঘণ্টা বাজায় না তো—"

পুরন্দরবাবু হকচকিয়ে গেলেন একটু।

"আমার কাছেও" মৃদুকণ্ঠে যুগলও বললে, একটু ভয়ে ভয়ে। ঘণ্টার আওয়াজের চোটে সে'ও আত্মস্থ হয়েছিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করে' পুরন্দরবাবু এগিয়ে গেলেন এবং কপাটটা খুললেন।

"আপনিই কি পুরন্দরবাবু ?" কনকনে জোর গলায় প্রশ্ন করলে কে একজন।

"হ্যাঁ, কি চাই ?"

"যুগল পালিত এখানে আছেন শুনলাম। তাঁর সঙ্গে এখনি দেখা করতে চাই আমি।"

পুরন্দরবাবু কম বয়সী ছোকরাটিকে আপাদমস্তক দেখলেন একবার। যদিও তাঁর ইচ্ছে করছিল লাথিয়ে ছোকরাকে দূর করে' দিতে —কিন্তু তা আর করলেন না।

"আসুন, এই যে যুগলবাবু এখানেই আছেন—"

ছোকরাটির বয়স সত্যিই কম, উনিশ কুড়ির বেশী হবে না, কমও হতে পারে। তার মুখের কিশোর শ্রী, স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি, দৃপ্ত উন্নত মস্তক দেখলে তাই মনে হয়। সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবীতেই চমৎকার মানিয়েছিল তাকে। একটু লম্বা ধরণের, মাথায় কোঁকড়ান চুল, বড় বড় কালো চোখে নির্ভিক দৃষ্টি। সুশ্রী ছেলেটি। খুব গম্ভীর ভাবে ঘরে এসে ঢুকল সে।

"আপনিই যুগলবাবু? ও—"

বেশ গম্ভীর ভাবে সে যুগলবাবুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলে। "ও" কথাটাও এমনভাবে বললে যে যুগল ভড়কে গেল একটু।

পুরন্দরবাবু আভাসে যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, যুগলের মনেও কিসের যেন ছায়াপাত হল একটা। চোখে মুখে আশঙ্কা ঘনিয়ে এল তার। আচরণে কিন্তু সে কোন বিচলিতভাব প্রকাশ করলে না। বেশ গম্ভীরভাবেই বললে—"আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ইতি-পূর্ব্বে হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আমার সঙ্গে আপনার কি দরকার থাকতে পারে? ভুল করেন নি তো?"

"আগে আমার কথাটা শুনে নিন, তারপর যা বলবার বলবেন"—বেশ একটু অভিভাবকী ভঙ্গিতে কথা ক'টি বলে ছেলেটি টেবিলে মদের বোতল ও গ্লাস দুটোর দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ সে দিকে চেয়ে থাকবার পর যুগলের দিকে ফিরে শান্ত কণ্ঠে বললে—"দিলীপ হালদার—"

"দিলীপ হালদার মানে?

"আমিই। আমার নাম শোনেন নি ?"

"না।"

"ও, শোনবার কথাও নয় আপনার। একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আছে আপনার সঙ্গে। বসব ? বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

"বসুন বসুন।"

পুরন্দরবাবু বলে' উঠলেন, কিন্তু তার আগেই ছোকরা একটা চেয়ার টেনে বসেছিল। পুরন্দরবাবুর বুকের ব্যথা যদিও বাড়ছিল ক্রমশঃ কিন্তু এই ছেলেটীর আকস্মিক আগমন, সপ্রতিভ ব্যবহার বেশ লাগছিল তাঁর। তার তরুণ সুন্দর মুখশ্রীতে পারুলকে মনে পড়ছিল।

"আপনিও বসুন না" যুগলের দিকে চেয়ে ছেলেটি বললে এবং মাথা নেড়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলে।

"না, আমি বেশ আছি।"

"ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। পুরন্দরবাবু, আপনি যদি থাকতে চান থাকুন।"

"আমি আর যাব কোথায় নিজের বাসা থেকে—"

"আপনার যা খুশী। সত্যি কথা বলতে কি, আপনি থাকলে বরং ভালই হয়। পারুলের আছে আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে—"

"পারুলের কাছে ? বাঃ! কখন শুনলেন এর মধ্যে ?

"আপনারা চলে আসবার ঠিক পরেই। আমি সেখান থেকেই সোজা আসছি। যুগলবাবুকে একটা কথা বলতে চাই—" যুগলের দিকে ফিরে তারপর বললে—"আমরা—মানে পারুল আর আমি—ছেলেবেলা থেকে পরস্পরকে ভালবেসে আসছি এবং ঠিক করেছি যে আমরা বিয়ে করব। আপনি হঠাৎ আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে হাজির হয়েছেন, আমি বলতে এসেছি যে আপনি সরে পড়ুন। আমাদের এ অনুরোধ রক্ষা করতে কি আপত্তি আছে আপনার ?"

"নিশ্চয়! বিশেষ আপত্তি আছে।"

"ও, বাবা, তাই না কি ?"

ছেলেটি গম্ভীর ভাবে চেয়ারে ঠেস দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে দিলে।

"আমি আপনাকে চিনি না, সুতরাং আপনার সঙ্গে এসব আলোচনার কোন মানে নেই।"

এই বলে' যুগল বসে পড়াটাই সমীচীন মনে করলে।

"বলেছিলাম আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। এখনি তো আপনাকে বললাম যে আমার নাম দিলীপ হালদার—পারুল আর আমি দুজনেই দুজনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং 'আমি আপনাকে চিনি না' বলে' ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে ? আমার সব বক্তব্যও শোনেন নি আপনি এখনও। তাছাড়া আমার কথা না হয় ছেড়েই দিন—আপনি পারুলকে যে এমন বেহায়ার মতো জ্বালাতন করছেন রোজ—এই কথাটাই তো বিশেষ করে আলোচনাযোগ্য।"

একটি একটি করে' মুখ টিপে টিপে কথাগুলি এমন ভাবে সে বললে যে মনে হল যেন নিতান্ত বাধ্য হয়েই অপ্রিয় কথাগুলো বলতে হচ্ছে তাকে।

"দেখ ছোকরা"—আত্মবিস্মৃত যুগল চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু ছোকরা তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিলে তাকে।

"দেখুন, অন্য সময় হ'লে আপনার ওই "ছোকরা" কথায় আপত্তি করতুম আমি। এখন করব না, কারণ একথা আপনাকেও মানতে হবে যে কম বয়সটাই আমার একমাত্র মূলধন এক্ষেত্রে। আজ সকালে যখন পারুলকে ব্রেসলেট উপহার দিচ্ছিলেন তখন আপনিও ছোকরা হতে পারলে বেঁচে যেতেন।"

"মহা ফাজিল তো" পুরন্দরবাবু মনে মনে বললেন।

"যাই হোক" যুগল উত্তর দিলে "আপনার সঙ্গে তর্ক করব না আমি। আমার মনে হচ্ছে আপনি যে সব কারণ দেখাচ্ছেন তা আপনার মনগড়া,

ও সব নিয়ে কোন কথা আর আমি কইব না আপনার সঙ্গে, কইলে নিতান্ত ছেলেমানুষি হবে তা আমার পক্ষে। কাল আমি বিশ্বম্ভরবাবুর কাছে গিয়ে খোঁজ করব। আপনি এখন যেতে পারেন।"

"দেখছেন কি রকম লোক" বলে' দিলীপ পুরন্দরবাবুর দিকে চাইলে। "আজ এত অপমানিত হয়েও লজ্জা হয় না ওঁর। উনি আমাদের নামে নালিশ করতে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে যেতে চান আবার! এর থেকে কি প্রমাণ হয়? প্রথমত প্রমাণ হয় যে আপনি অত্যন্ত আত্মসম্মানহীন একগুঁয়ে লোক, দ্বিতীয়ত প্রমাণ হয় যে আপনি এই বর্ব্বর সমাজের নিষ্ঠুরপ্রথার সুযোগ নিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে জোর করে' পারুলকে বিয়ে করতে চাইছেন তার মতের বিরুদ্ধে। পারুল আপনাকে ঘৃণা করে এইটুকু জানামাত্রই থেমে যাওয়া উচিত আপনার, সে তো আপনার ব্রেসলেট পর্য্যন্ত ফেরত দিয়েছে—এর পরেও যাবেন আপনি?"

"ব্রেসলেট আমাকে ফেরত দেয় নি সে। ওসব একদম বাজে কথা।"

"ফেরত দেয় নি! আপনি বলতে চান পুরন্দরবাবুর কাছ থেকে আপনি ব্রেসলেট ফেরত পান নি?"

"আঃ, ডোবালে দেখছি" মনে মনে কথাগুলো উচ্চারণ করে' পুরন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে' বললেন—হ্যাঁ, পারুল আমাকে এইটে ফেরত দিতে দিয়েছিল যুগলবাবু, আমি নিতে চাই নি, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়লে না⋯এই নিন⋯ এমন মুস্কিলে ফেলেছেন আমাকে আপনারা।"

ব্রেসলেটের বাক্সটা বার করে' পুরন্দরবাবু টেবিলের উপর রাখলেন। যুগল বজ্রাহতবৎ নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল।

"আপনি এটা এতক্ষণ দেন নি যে" একটু রূঢ়কণ্ঠেই দিলীপ বলে' উঠল।

"হয়ে ওঠে নি। মনেই ছিল না।"

"অদ্ভুত কাণ্ড।"

"কি বললেন?"

"একটু অদ্ভুত নয়? যাক গে···"

পুরন্দরবাবুর ইচ্ছে করতে লাগল উঠে ছোঁড়ার কান মলে' দেন, কিন্তু তিনি হেসে ফেললেন, ছোকরাও হাসতে লাগল। যুগল কিন্তু একটুও হাসল না, তার অবস্থা ভয়ানক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুরন্দরবাবু যখন দিলীপের দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন তখন যদি তিনি যুগলের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেন তাহলে বুঝতে পারতেন কি ভয়াবহ কাণ্ড হচ্ছে তার মনের ভিতর। কিন্তু তবুও পুরন্দরবাবুর মনে হল, এই দুঃসময়ে যুগলের পক্ষ নেওয়া উচিত।

"দেখুন দিলীপবাবু, একটা কথা শুনুন আমার" বন্ধুভাবে আরম্ভ করলেন তিনি "এ বিষয়ে অন্য কোন আলোচনা না করেও একটা কথা বলতে চাই শুধু আমি। পারুলের পাণি-প্রার্থী হিসেবে যুগলবাবুর একাধিক যোগ্যতা আছে—প্রথমত ওঁরা যুগলবাবুকে আগে থাকতে চেনেন, ওঁর সম্বন্ধে সব জানেন, দ্বিতীয়ত উনি বড় চাকরি করেন একটা, তৃতীয়ত ওঁর বিষয়সম্পত্তিও যথেষ্ট আছে—সুতরাং আপনার মতো একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর আকস্মিক আবির্ভাবে উনি আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন একটু। আপনিও হয়তো খুব উপযুক্ত পাত্র—কিন্তু আপনার বয়স এত কম যে উনি আপনার কথা বিশ্বাস করতে ইতস্তত করছেন...তাই এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে না চাওয়াটা স্বাভাবিক ওঁর পক্ষে।"

"আপনার বয়স এত কম—মানে কি বলতে চান আপনি! আমি উনিশ বছরে পড়েছি···আইনত আমার বিয়ে করবার বয়স হয়েছে।'

"তা হয়েছে। কিন্তু কোন্ মেয়ের বাবা আপনার হাতে কন্যাসম্প্রদান করবে বলুন? আপনি ভবিষ্যতে হয়তো কোটিপতি হবেন, কিম্বা মানব-জাতির মুক্তির পথ আবিষ্কার করবেন কিন্তু এখন আপনাকে দেখে কোন মেয়ের বাপই পাত্র হিসেবে পছন্দ করবে কি না সন্দেহ। উনিশ বছর বয়সে লোকে নিজের দায়িত্বই নিতে পারে না, আর আপনি আর একজনের দায়িত্ব

নিতে যাচ্ছেন এবং সেও আপনার মতো ছেলেমানুষ। এইটেই কি উচিত? আমার যা মনে হচ্ছে খোলাখুলি বলছি বলে' রাগ করবেন না, আপনি নিজেই আমাকে মধ্যস্থতা করতে ডাকলেন বলে' বলছি।"

'দিলীপ একটু বিস্ময়ে চেয়ে রইল পুরন্দরবাবু দিকে। তারপর বলল "আপনার মুখ থেকে এসব কথা শুনব প্রত্যাশা করিনি। পারুল যা বললে আপনার সম্বন্ধে তাতে আমার একটু অন্য রকম ধারণা হয়েছিল এখন দেখছি আপনারা সবাই একরকম, সব শিয়ালেরই এক রা। আপনাদের ওসব জ্ঞানগর্ভ যুক্তি অনেকই শুনেছি কিন্তু তা মানবার উপায় নেই, কারণ একটা প্রবলতর যুক্তি আমাদেরও আছে।"

"কি সেটা?'

"আমরা পরস্পরকে ভালবাসি এবং অনেকদিন থেকে বাসছি। সুতরাং আপনার ওসব যুক্তি শুনব না আমরা। আপনার বয়স কত হল—পঞ্চাশ?"

"সে জেনে আর কি হবে আপনার। যা বলবেন বলুন।"

"মাপ করবেন, কৌতুহলটা সামলাতে পারলাম না। যাক্ গে—হ্যাঁ—দেখুন আপনি যে এখনই বলছিলেন—আমি কোটিপতি বা মহামানব কিছুই হব না হয় তো—কিন্তু বিয়ে করে যে সংসার চালাতে পারব সে বিষয়ে আমার কিছু সন্দেহ নেই। এখন অবশ্য আমি নিঃস্ব, পারুলদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছি—বিশ্বম্ভরবাবুকে জ্যাঠামশাই বলি।"

"ও, তাই নাকি?"

"আমার বাবা আর বিশ্বম্ভরবাবু খুব বন্ধু ছিলেন। আমরা পশ্চিমে থাকতাম। একবার প্লেগে আমাদের বাড়ির সবাই মারা গেল—এক আমি ছাড়া। জ্যাঠামশাই আমাকে মানুষ করেছেন—বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়েছেন আমাকে। জ্যাঠামশাই লোক খুব ভাল, বুঝলেন—"

"জানি।"

"কিন্তু ওঁর মতামত বড় সেকেলে ধরণের। এখন অবশ্য আমি

আর ওঁদের বাড়ি থাকি না, আলাদা মেসে থেকে রোজকারের চেষ্টা করছি।"

"কতদিন থেকে?"

"চার মাস।"

"চাকরি পেয়েছেন ?"

"পেয়েছি একট ছোটখাট গোছের। পঁচাত্তর টাকা মাইনে, তার আগে আর একটা পেয়েছিলাম, মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা পেতাম, তখনই আমি বিয়ের কথা বলেছিলাম।"

"কাকে ?"

"জ্যাঠামশাইকে।"

"তিনি প্রথমে হেসেই উঠলেন, তারপর চটে গেলেন। পারুলকে আমার সঙ্গে দেখাই করতে দিতেন না। আসল কি কারণ জানেন ? উনি আমাকে ওকালতি পড়তে বলেছিলেন—কিন্তু উকীল হয়ে কি হবে বলুন তো ! তার চেয়ে রোজকার করাই তো ভাল এখন থেকে। তাই ওঁর রাগ। আমি সেইজন্যে আর যাই না বড় সেখানে। পারুল কিন্তু ঠিক আছে এসব সত্ত্বেও। আমি জানি সে তার প্রতিজ্ঞা রাখবেই।"

"আপনি ওদের বাড়ি যান না বলছেন, তাহলে পারুলের সঙ্গে কথা হল কি করে ?"

"কেন, ওদের বাগানের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে। সেই কটা মেয়েটিকে মনে আছে ? সে আমাদের দিকে,—কঙ্কনা দিদিও। ওকি ! আপনি অমন করলেন যে ? বাজের শব্দে ভয় করে না কি আপনার—বাইরে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছিল।

"না, আমার বুকের কাছটা ব্যথা করছে অনেকক্ষণ থেকে।"

সত্যিই পুরন্দরবাবু ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ছিলেন। একটু কুঁজো হয়ে তিনি দাঁড়ালেন।

"ও, তাহলে আমি যাই। আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি থাকতে অসুবিধে হচ্ছে আপনার।"

"না, কিছু অসুবিধে নেই।"

"চললাম তবু। হ্যাঁ, দেখুন অখিলবাবু—ও, যুগলবাবু বুঝি আপনার নাম? দেখুন যুগলবাবু কি ঠিক করলেন আপনি তাহলে?"

হাস্যদীপ্ত দৃষ্টিতে যুগলের দিকে চাইলে সে।

"পারুলকে রেহাই দিচ্ছেন তো? দিন, বুঝলেন। দিলেন তো?"

"না—" যুগল অধীরভাবে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। প্রায় ক্ষেপে যাবার মতো অবস্থা হয়েছিল তার—"আপনি দয়া করে' আমাকে রেহাই দিন"! তর্জনী আস্ফালন করে দিলীপ বললে—"ভুল করছেন আপনি কিন্তু তা বলে' দিচ্ছি। পারুলকে আমি চিনি, সে মরে যাবে তবু আপনাকে বিয়ে করবে না। হিসেবে ভুল করবেন না। ন' মাস পরে ফিরে এসে দেখবেন খাঁচা খালি, পাখী উড়ে গেছে। এরকম 'ডগ্ ইন দি ম্যানজার' পলিশির মানেটা কি বুঝতে পারছি না। মাপ করবেন, উপমার খাতিরে কথাটা বললাম। জিনিষটা ভেবে দেখুন না, চেষ্টা করুন অন্তত।"

"দেখুন আপনার বক্তৃতা শোনবার ইচ্ছে নেই আমার। আপনি যা যা বলে গেলেন সব মনে থাকবে আমার। আপনি যে সব অভদ্র ইঙ্গিত করলেন তা নিয়ে এখন প্রতিবাদ করতে চাই না। কাল এর ব্যবস্থা করব।"

"অভদ্র ইঙ্গিত? তার মানে! আমার কথাগুলো যদি আপনার অভদ্র ইঙ্গিত বলে' মনে হয় তাহলে আপনার মনই অভদ্র বুঝতে হবে। আচ্ছা বেশ, কালকের জন্যে প্রস্তুত থাকব আমি। কিন্তু যদি···আঃ আবার বাজ পড়ল একটা···আচ্ছা চলি। নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভারী খুসী হলাম" পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে হেসে মাথা নেড়ে দিলীপ বেরিয়ে গেল। বাইরে ঝড় উঠল একটা।

১৫

"দেখলেন? দেখলেন কাণ্ডটা? দিলীপ চলে যেতেই যুগল পুরন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে গেল।

"আপনার কপালটাই খারাপ" পুরন্দরবাবু উত্তর দিলেন—অর্থাৎ যা মনে এল বলে ফেললেন। বুকের ব্যথাটা এমন বেড়ে উঠছিল যে ভেবে চিন্তে উত্তর দেবার ধৈর্য্য থাকছিল না তাঁর আর।

"আমার প্রতি সহানুভূতিবশতঃই আপনি ব্রেসলেটটা ফেরত দেন নি নিশ্চয়!"

"সময় পেলাম কোথা···"

"আপনার কষ্ট নিশ্চয়ই হয়েছিল, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আপনি।"

"হ্যাঁ, কষ্ট হয়েছিল বই কি" বাধ্য হয়ে পুরন্দরবাবুকে বলতেই হল। তিনি সংক্ষেপে ব্যাপারটা বর্ণনা করলেন—পারুলের আগ্রহাতিশয্যেই যে ব্রেসলেটটা নিয়ে এসেছেন তাও বললেন।

"পারুল অত জোর না করলে কিছুতেই নিতাম না আমি···এমনিতেই তো নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেছি।"

"পারুল আপনাকে সম্মোহিত করে' ফেলেছিল, সোজা কথা বলুন না।"

"কি যা তা বলছেন। এখনই তো দেখলেন যে পারুলের আপনার উপর বিরাগের কারণ আমি নই। ভিতরে অন্য লোক আছে।"

"আছে। কিন্তু আপনিও সম্মোহিত হয়েছিলেন।"

যুগল চেয়ারে বসে' গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল।

"আপনি কি ভাবছেন ছোঁড়াটার ভয়ে ভড়কে যাব আমি ? কালই চাটনি বানিয়ে ফেলব ব্যাটাকে, বুঝলেন ? ধোঁয়া দিয়ে যেমন করে মশা তাড়ায়, ঝাঁটা দিয়ে ধুলো ঝাড়ে—তেমনি করে' বিদেয় করব।"

এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে' আবার ঢাললে। বেশ 'মাই ডিয়ার' হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

"পারুলবালা দিলীপকুমার, মাণিকজোড় আমার, মরি মরি—হি—হি—হি" রাগে বুকটা পুড়ে যাচ্ছিল তার। আর একটা বাজ পড়ল খুব জোরে—এক ঝলক বিদ্যুতের আলো জানালা দিয়ে ঢুকল। বৃষ্টিও সুরু হল মুষলধারে। যুগল উঠে জানালাটা বন্ধ করে' দিলে।

"আপনাকে জিগ্যেস করছিল বাজ পড়লে আপনি ভয় খান কি না' হি—হি—হি। আপনার বয়সও পঞ্চাশ ঠাউরেছে—আঁ—খিঃ খিঃ—"

পৈশাচিক ভাব ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

"মনে হচ্ছে রাতটা এখানেই কাটাবেন আপনি" অতি কষ্টে পুরন্দরবাবু কথাগুলো উচ্চারণ করলেন। ব্যথাটা বেশ বেড়ে উঠছিল—"আমি শুয়ে পড়ছি, আপনি যা খুশী করুন।"

"এই বৃষ্টিতে বেরুই কি করে' বলুন!"

"বেশ তো থাকুন না, যত খুশী মদ গিলুন, গিলে শুয়ে পড়ুন।"

পুরন্দরবাবু সোফাটায় লম্বা হয়ে শুলেন এবং মৃদু আর্তনাদ করলেন।

"রাত্রে থাকতে বলছেন আমাকে ? ভয় করবে না আপনার ?"

"কিসের ভয় ?" মাথা তুলে প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

"না কিছু নয়। সেবার ভয় পেয়েছিলেন না ? তাই বলছি—"

"এত বাজে কথাও বলতে পারেন।"

পুরন্দরবাবু রেগে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলেন।

যুগলের মুখে একটা অদ্ভুত নীরব হাসি ফুটে উঠল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দরবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। সমস্ত দিনের মানসিক

ও দৈহিক উত্তেজনায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যথার চোটে ঘুমুতে পারলেন না বেশীক্ষণ, ঘণ্টাখানেক পরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আস্তে আস্তে উঠলেন তিনি বিছানা থেকে। ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে, সমস্ত ঘরটা সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরতি টেবিলের উপর খালি বোতলটা পড়ে রয়েছে, আর একটা সোফায় যুগল ঘুমুচ্ছে! চিৎ হয়ে ঘুমুচ্ছে, জামা জুতো কিছু খোলে নি। পুরন্দরবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে খানিকক্ষণ। দুঃখ হল। জাগালেন না তাকে। আস্তে আস্তে ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, ব্যথার চোটে শুতে পারছিলেন না। ভয় করছিল তাঁর এবং ভয় করবার কারণও ছিল। এ রকম ব্যথা মাঝে মাঝে বছরে দু'একবার হয় তাঁর, এর ধরণ ধারণ জানা আছে ভাল করে'। লিভারের ব্যথা। প্রথমে কেমন যেন একটা আড়ষ্ট টাটান ভাব হয়, তারপর বুকের কোন একটা জায়গায় কাঁধের কাছে বরাবর টন টন করতে থাকে। তারপর বেড়ে চলে ক্রমশঃ। দশ ঘণ্টা বার ঘণ্টা চলে, শেষে মনে হয় প্রাণটা বেরিয়ে গেল বুঝি। বছর খানেক আগে শেষবার হয়েছিল। এমন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন যে হাত পর্য্যন্ত নাড়তে পারছিলেন না—ডাক্তারে পাতলা চা ছাড়া আর কিছু খেতে দেয় নি। পরে একবার ক্রমাগত বমি হয়ে তবে কমল। শেক দিলেও কমে যায় অনেক সময়। যখন কমে তখন হঠাৎ কমে যায়। ···দেখতে দেখতে ব্যথাটা বেড়ে উঠল খুব। দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। এত রাত্রে ডাক্তার ডাকা মুস্কিল—হুট্ করে ডাকতেও চান না—কতকগুলো বাজে ওষুধ গেলাবে এসে। ব্যথায় কাতরাতে লাগলেন...কাতরাণির শব্দে যুগলের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসল সে এবং হতভম্ব হয়ে রইল খানিকক্ষণ। পুরন্দরবাবু ছটফট করে বেড়াচ্ছিলেন।

"আপনার ব্যথাটা বাড়ল না কি? শেক দিন, কম্প্রেস। চাকরটাকে ডাকব?"

"না থাক।"

কিন্তু যুগল ব্যস্ত হয়ে উঠল। এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল যেন তার একমাত্র ছেলের প্রাণ-সংশয়। পুরন্দরবাবুর কথায় কর্ণপাত না করে' সে চাকরটাকে উঠিয়ে ষ্টোভ জেলে গরম জল চড়িয়ে দিলে।

"দু'তিন কাপ গরম গরম চা খেয়ে ফেলুন।"

নিজেই চা করলে। চা খাইয়ে তারপর গরম গরম কম্প্রেস দিতে লাগল পুরন্দরবাবুর গেঞ্জি আর রুমালের সাহায্যে।

"খুব গরম গরম দিন, খুব গরম গরম।"

পুরন্দরবাবু যত আপত্তি করতে লাগলেন, যুগলের উৎসাহ তত বাড়তে লাগল।

"আর একটু চা খাবেন? জল আছে এখনও, খুব গরম খেতে হবে কিন্তু—"

আবার সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আধ ঘণ্টা পরে ব্যথাটা সত্যি কমল। যুগলের ইচ্ছে ছিল আরও কিছুক্ষণ কম্প্রেস দেওয়া, কিন্তু পুরন্দরবাবু আর কিছুতেই রাজি হলেন না।

"এবার ঘুমুতে দিন একটু।"

"বেশ বেশ। ঘুমোন—"

"আপনি যাবেন না, থাকুন। ক'টা বেজেছে?"

"পৌনে দুটো।"

"থাকুন আপনি, যাবেন না।"

মিনিটখানেক পরে পুরন্দরবাবু যুগলকে ডেকে মৃদুকণ্ঠে বললেন—"আপনি, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী মহৎ। আমি সব বুঝতে পারছি, সব···অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।"

"ঘুমিয়ে পড়ুন, বাতি নিবিয়ে দিচ্ছি।"

পা টিপে টিপে যুগল নিজের বিছানার দিকে চলে গেল।

বাতি নিবিয়ে দেবার পর পুরন্দরবাবু যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তাতে কোন

সন্দেহ নেই। এটা স্পষ্ট মনে ছিল তার। কিন্তু যতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন জেগে ওঠার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তিনি ঘুমুতে পারছেন না, নিদারুণ ক্লান্তি সত্ত্বেও কিছুতেই ঘুম আসছে না তাঁর। শেষে তাঁর মনে হতে লাগল যেন জেগে কিসের একটা ঘোরে আছেন তিনি, তাঁর আশেপাশে কি সব ছায়া মূর্ত্তি ঘুরছে, তাদের কিছুতেই তাড়াতে পারছেন না —অথচ এটা যে স্বপ্ন—সত্যি কিছু নয়—এ জ্ঞানও তাঁর আছে। ছায়ামূর্ত্তি-গুলো সবই পরিচিত : ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে দলে দলে. কপাটটা খোলা রয়েছে, আরও আসছে, সিঁড়িতে ভীড় জমে গেছে। ঘরের মাঝখানে যে টেবিলটা আছে···তার পাশে কিন্তু একটিমাত্র লোক বসে আছে···ঠিক এক মাস আগে যেমন দেখেছিলেন তেমনি। ঠিক আগের স্বপ্নে যেমন দেখে ছিলেন এবারও লোকটা টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে বসে আছে, চুপ করে বসে আছে, একটি কথা বলছে না। কিন্তু এবার লোকটা যেন বেঁটে···অনেকটা যুগলের মতো। "সেবারও যুগলকেই দেখেছিলাম না কি" পুরন্দরবাবু ভাবতে লাগলেন। লোকটার মুখের দিকে ভাল করে' চেয়ে দেখলেন—এ অন্য লোক। বেঁটে কেন এত? আশ্চর্য্য! চীৎকার, কোলাহল, কলরবে চতুর্দ্দিক ভরে উঠল। গতবারের চেয়ে এবার লোক গুলো যেন আরও বেশী উত্তেজিত, সবাই মার-মুখী আর সবাই তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁকে লক্ষ্য করে' সবাই কি যেন বলছে—চীৎকার করেই বলছে—কিন্তু কি বলছে বুঝতে পারছেন না তিনি ঠিক। "এ কিছু নয়, স্বপ্ন,"—দু'একবার ভাবলেন তিনি—"ঘুম আসছে না, তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখছি শুধু" —কিন্তু ওই চীৎকার, ওই লোকের ভীড়, ওদের তর্জ্জন গর্জ্জন এত বেশী রকম জীবন্ত যে মাঝে মাঝে সন্দেহও হচ্ছিল। সত্যি স্বপ্ন? উঃ কি চীৎকার! এরা চায় কি? কিন্তু···স্বপ্নই, তা না হলে যুগলের ঘুম ভেঙে যেত ঠিক। ওই তো সোফায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে! তারপর হঠাৎ এক কাণ্ড হল···আগের বারও ঠিক এমনি হয়ে ছিল। সবাই এক সঙ্গে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নাবতে গেল.

কিন্তু দুয়ার দিয়ে বেরুতে পাচ্ছে না, আর একদল ঢোকবার চেষ্টা করছে। যারা ঢোকবার চেষ্টা করছে তারা যেন ভারী কি একটি বস্তু বয়ে আনছে—সিঁড়ির উপর তাদের পদশব্দ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে একটা গুরুভার বহন করে' আনছে তারা, কথাবার্ত্তা থেকে বোঝা যাচ্ছে—হাঁপিয়ে পড়েছে। ঘরের মধ্যে যারা ছিল তারা চীৎকার করে' উঠল সমস্বরে—এনেছে, এনেছে। সকলের দৃষ্টি পুরন্দরের উপর পড়ল গিয়ে, সকলেই সিঁড়ির দিকে আঙ্গুল দেখাতে লাগল—এমন ভাবে যেন এইবার পুরন্দরকে কবলের মধ্যে পাওয়া গেছে। এটাকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে আর সাহস হল না পুরন্দরবাবুর। তিনি বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে গিয়ে বুড়ো আঙ্গুলের উপর দাঁড়িয়ে সকলের মাথার উপর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন কি আনছে ওরা। বুকের ভিতরটায় হাতুড়ি পিটছে কে যেন। তারপর হঠাৎ আগের বার যেমন হয়েছিল—ঠিক তেমনিভাবে ইলেট্রিক বেলটা বেজে উঠল—ঠিক তিনবার। এত স্পষ্ট, এত বাস্তবিক যে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিন্তু সেবার যেমন দরজার দিকে ছুটে গিয়ে ছিলেন এবার তা গেলেন না। কি ভেবে যে গেলেন না, বস্তুত কোন ভাবনা সে সময় তাঁর মনে এসেছিল কি না, তা বলা শক্ত—কিন্তু কি করা উচিত তা কে যেন তাঁর কানে কানে বলে দিলে। তিনি একটি আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েই বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন। এবং যুগল যেখানে শুয়েছিল সেই দিকে ছুটে গেলেন। হাত বাড়াতেই আর একটি হাতের সঙ্গে ধাক্কা লাগল এবং সে হাতটা তিনি মুটো করে' চেপে ধরলেন—ও, তাহলে একজন তাঁর বিছানার কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল এসে। ঘরে অন্ধকার বিশেষ নেই, ভোরের আলো ঘরে ঢুকছে। হঠাৎ একটি তীব্র যন্ত্রণা তিনি অনুভব করলেন তাঁর বাঁ হাতের আঙ্গুল-গুলোতে—যেন একটি ধারাল ছুরি কিম্বা ক্ষুর তিনি মুটো করে' ধরেছেন... সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে একটি গুরুভার পতনের শব্দ হল!

পুরন্দরবাবু যুগলের চেয়ে অন্ততঃ তিন গুণ বেশী শক্তিশালী, তবু কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হল—পুরো তিনটি মিনিট। তারপর তিনি তাকে চিৎ করে' কেবল তার হাত দুটো বেঁকিয়ে পিঠের দিকে নিয়ে গেলেন, তারপর তাঁর মনে হল হাত দুটো বাঁধা উচিত। কাটা বাঁ হাত দিয়ে তাকে চেপে রেখে, ডান হাত বাড়িয়ে তিনি পরদার দড়িটা ছিঁড়ে নিলেন। কি করে, এত কাণ্ড করতে পারলেন পরে তা ভেবে নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন। এই তিন মিনিট দুজনের মধ্যে কেউ একটি কথা বলেন নি, জোরে জোরে নিশ্বাসের শব্দ আর ধস্তাধস্তির অস্ফুট শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ ছিল না। হাত দুটো পিছনে বেঁধে তাকে মেঝের উপর চিৎ করে' ফেলে রেখে পুরন্দরবাবু উঠলেন এবং জানালাগুলো খুলে দিলেন। সকাল হয়ে গেছে। জানালার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর ড্রয়ারটা খুলে একটা ফরসা তোয়ালে বার করে' হাতে জড়ালেন সেটা—রক্ত পড়ছিল। দেখতে পেলেন মেঝের উপর একটা খোলা ক্ষুর পড়ে রয়েছে। সেটা তুলে মুড়ে খাপে বন্ধ করে' ফেললেন। কাল সকালে কামাবার পর ক্ষুরটা তুলতে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। যুগল যে সোফাটায় শুয়ে ছিল তারই পাশে ছোট টেবিলটার উপর পড়েছিল ক্ষুরটা। ক্ষুরটা ড্রয়ারে বন্ধ করে' রেখে দিলেন। এই সমস্ত করে' তারপর যুগলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি।

যুগল ইতিমধ্যে মেঝে থেকে কোনক্রমে উঠে একটা ইজিচেয়ারে গিয়ে বসেছিল। তার গায়ে একটা কামিজ ছাড়া আর কিছু ছিল না। পায়ে জুতোও ছিল না। কামিজের হাতটা রক্তে ভেজা। পুরন্দরবাবুর রক্ত। তার চেহারা অদ্ভুত রকম বদলে গিয়েছিল—সে লোকই নয় যেন। পিছনে হাত দুটো বাঁধা থাকাতে ভালভাবে চেয়ারে বসতে পারে নি, বাঁকাভাবে বসেছিল। সমস্ত মুখটা যেন মুচড়ে গিয়েছিল, মুখের রংও কেমন যেন অস্বাভাবিক নীলচে গোছের, চিবুকটা মাঝে মাঝে কাঁপছিল থর থর করে'।

পুরন্দরবাবুর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে ছিল সে···কিন্তু সে চাউনিতে যেন দৃষ্টি নেই, প্রাণহীন ভাষাহীন চাউনি। হঠাৎ সে বোকার মতো হাসলে একটু তারপর জলের কুঁজোটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ইতস্তত: করে' বললে—"একটু জল খাব।" পুরন্দরবাবু একগ্লাস জল গড়িয়ে মুখের কাছে ধরতেই সে তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে কয়েক ঢোঁক জল খেলে, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাইলে পুরন্দরবাবুর দিকে, তারপর আবার খেতে লাগল। জল খাওয়ার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে' বসে রইল। পুরন্দরবাবু নিজের বালিশ এবং চাদরটা নিয়ে পাশের ঘরে শুতে গেলেন, যুগলের ঘরটার তালা বন্ধ করে দিলেন।

কালকের ব্যথাটা আর ছিল না কিন্তু এই প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির পর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করছিলেন তিনি। সমস্ত ব্যাপারটা ভালভাবে ভেবে দেখবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। সমস্তই কেমন যেন অসংলগ্ন মনে হতে লাগল। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসছিল, চোখের সামনে অন্ধকারের মতো ঘনিয়ে আসছিল কি একটা—আবার চমকে উঠে পড়ছিলেন। মনে পড়ে যাচ্ছিল সব, তোয়ালে জড়ানো হাতের কাটা আঙ্গুলগুলো জ্বালা করছিল...আবার প্রাণপণে ভেবে দেখবার চেষ্টা করছিলেন ব্যাপারটা। একটা বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় হয়েছিলেন...এ কাজ করবার মিনিট দশেক আগে সে নিজেই জানত না বোধ হয় যে এ কাজ সে করবে। ক্ষুরটা হঠাৎ চোখে পড়ে' গিয়েছিল।

"প্রথম থেকেই যদি ওর উদ্দেশ্য থাকত আমাকে খুন করা তাহলে নিজেই ও ছোরা বা ক্ষুর নিয়ে আসত। আমার ক্ষুরের উপর নির্ভর করত না—তাছাড়া আমার ক্ষুর তো বাইরে থাকে না কখনও—কালই ভুলে ফেলে রেখেছিলাম..." নানা চিন্তার মধ্যে এই কথাটা বারবার মনে হতে লাগল তাঁর।

ছ'টা বাজল। পুরন্দরবাবু উঠে পড়লেন, জামা কাপড় বদলালেন,

তারপর যুগলের ঘরে গেলেন। তালা খুলতে খুলতে তাঁর মনে হল শুধু শুধু তালা বন্ধ করতে গেলাম কেন, দূর করে' তাড়িয়ে দিলেই হত। ঘরে ঢুকে বিস্মিত হয়ে গেলেন। যুগল হাতের বাঁধন খুলে ফেলেছে কি করে' যেন। জামা জুতো পরে' তৈরী হয়ে বসে আছে চেয়ারে। তিনি ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল। তার চোখের দৃষ্টি যেন বলতে লাগল—"এ নিয়ে আর কিছু বলবেন না, বলবার কিছু নেই—"

"বেরিয়ে যান"—পুরন্দরবাবু বললেন—"আপনার ব্রেসলেট নিয়ে যান।"

দ্বারের কাছ থেকে যুগল ফিরে এল, ব্রেসলেটের বাক্সটা টেবিল থেকে তুলে পকেটে পুরে বেরিয়ে গেল। পুরন্দরবাবুও সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করবেন বলে' তার পিছু পিছু গেলেন। যুগল নাবতে নাবতে একবার ফিরে চাইলে, পুরন্দরবাবুর চোখের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত্ত, কি একটা বলবে বলে' যেন ইতস্তত করতে লাগল।

"যান"—হাত নেড়ে পুরন্দরবাবু বললেন।

সে নেবে গেল। পুরন্দরবাবু খিল বন্ধ করে' দিলেন।

১৬

পুরন্দরবাবু যেন নিশ্চিন্ত হলেন, একটা বোঝা যেন মন থেকে নেমে গেল। ভারী আরাম বোধ করলেন তিনি। অনির্দ্দিষ্ট যে যন্ত্রণাটা এতদিন ভোগ করছিলেন সেটার যেন অবসান হয়ে গেল সহসা। তোয়ালে বাঁধা হাতটা তুলে দেখলেন—"হ্যাঁ মিটে গেল এবার সব!" সেদিন পাপিয়ার কথাও মনে হল না একবার। যেন রক্তপাতের সঙ্গে সঙ্গে সে স্মৃতিও ধুয়ে গেছে মন থেকে।

মস্ত ফাঁড়া যে একটা কেটে গেল এ অবশ্য বুঝেছিলেন। এই লোকগুলো যারা খুন করবার এক মিনিট আগে পর্য্যন্ত জানে না যে তারা খুন করতে যাচ্ছে, হঠাৎ একটা ছুরি পেলে কম্পিত হস্তে যখন তারা একটা ঘুমন্ত লোকের গলায় ছুরি বসাতে যায়—তখন রক্তের ফিনিক একবার হাতে লাগলেই—এই ভীরু লোকগুলোই অন্য রকম হয়ে যায় হঠাৎ—সমস্ত মাথাটা ধড় থেকে নাবিয়ে দিতে পারে তখন বিনা দ্বিধায়।

তিনি বাড়িতে থাকতে পারলেন না, বেরিয়ে গেলেন। রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল অবিলম্বে কিছু একটা করা দরকার তা নাহলে কিছু একটা ঘটে যাবে বুঝি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কারও সঙ্গে কথা কইবার ভয়ানক ইচ্ছে করছিল, এমন কি অপরিচিত লোকের সঙ্গেও। এই জন্যেই বোধহয় ডাক্তারের কথা মনে পড়ল তাঁর—কাটা হাতটা ভাল করে' ব্যাণ্ডেজ করিয়ে নেবার অজুহাতে ডাক্তারের বাড়ি গেলেন তিনি। ডাক্তারবাবু পূর্ব্বপরিচিত লোক, যত্ন করে' কাটাটা দেখলেন, কি করে' কাটল জিগ্যেস করলেন। পুরন্দরবাবু হাসলেন

একটু, আর একটু হলে সব খুলে বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আত্মসম্বরণ করলেন। ডাক্তারবাবু নাড়িটা পরীক্ষা করে একদাগ ওষুধও খেতে দিলেন, তারপর বললেন যে, কাটা তেমন সাংঘাতিক নয়, সেরে যাবে দু'চার দিনে। সেদিন আরও দুবার সমস্ত কথা খুলে বলবার প্রলোভন হ'ল তাঁর—একবার তো সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন লোকের কাছে। আগে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপই করতে পরেতেন না তিনি পথে ঘাটে।

একটা দোকানে গিয়ে বই কিনলেন, কোট করাতে দিলেন একটা দর্জির কাছে। নীলিমা দেবীর কাছে যেতে ইচ্ছে করছিল না, তিনি আশা করছিলেন তারাই এসে পড়বে। হোটেলে ঢুকে খেলেন ভাল করে'। লিভারের ব্যথাটা আবার যে চাগাতে পারে এ কথা মনে হল না। তাঁর যে কোন ব্যাধি আছে একথা আর তাঁর মনেই হচ্ছিল না। তিনি যখন ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে যুগল পালিতকে অমন অবস্থায় পেড়ে ফেলতে পেরেছেন তখন তাঁর আর কোন অসুখই নেই। সন্ধ্যাবেলায় অবসন্ন বোধ করতে লাগলেন। যখন বাসায় ফিরলেন তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকতে কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। সমস্ত বাসাটারই কেমন যেন ভুতুড়ে-ভুতুড়ে ভাব, তবু চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। এমন কি যে রান্নাঘরে কখনও ঢোকেন না, সেখানেও উঁকি দিয়ে দেখলেন একবার। কপাটে খিল দিয়ে আলোটা জ্বাললেন। খিল দেবার আগে চাকরটাকে ডেকে একবার জিগ্যেস করলেন—যুগলবাবু এসেছিল কি? যেন যুগলবাবুর আসা সম্ভব এর পর!

ঘরে খিল দিয়ে ড্রয়ারটা খুললেন, ক্ষুরটা বার করে' ভাল করে' দেখলেন আবার। সাদা বাঁটটায় রক্ত লেগে আছে এখনও একটু। আবার বন্ধ করে রাখলেন সেটাকে। ঘুম পেতে লাগল, ভাবলেন আর দেরী না করে' এখনই শুয়ে পড়ি, কাল শরীরের গ্লানি কাটবে না তা' না হলে। কাল যে বিশেষ কিছু একটা ঘটবে এ কথা খালি মনে হচ্ছিল।

কিন্তু যে চিন্তাটা সমস্ত দিন তাঁকে একমুহূর্তের জন্য ছাড়ে নি, সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে যে কথাটা তিনি ক্রমাগত ভেবেছেন, এখন সেই চিন্তাগুলোই তাঁর ক্লান্তমস্তিষ্কে ভীড় করে' আসতে লাগল আবার। ঘুম এল না।

"আমাকে খুন করবার কথাটা তার হঠাৎই না হয় মনে হয়েছিল কাল, মানলাম—কিন্তু এর আগে কখনও কি সে একথা ভাবে নি একবারও?" শেষে এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তিনি—"যুগল আমাকে মারতে চেয়েছিল, কিন্তু খুন করবার কথা তার মনে হয় নি"—সংক্ষেপে—যুগল তাঁকে অজ্ঞাতসারে মারতে চেয়েছিল, সচেতন ভাবে নয়। যদিও এটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে—কিন্তু এইটেই সত্য। যুগল এখানে চাকরির জন্যেও আসে নি—পূর্ণ গাঙুলীর জন্যেও আসে নি—যদিও চাকরির চেষ্টা করেছিল, পূর্ণ গাঙুলীর সঙ্গে দেখাও করতে গিয়েছিল, পূর্ণ গাঙুলী ফাঁকি দিয়ে সরে' যাওয়াতে মর্মাহতও হয়েছিল খুব—কিন্তু তারপর তো আর পূর্ণ গাঙুলীর কথা একদিনও বলে নি—না, আসলে এসেছিল ও আমার জন্যে, আর সেইজন্যেই পাপিয়াকে নিয়ে এসেছিল..."

যুগল আমাকে খুন করতে পারে এ কথা কি ভেবেছিলাম আমি? তাঁর মনে পড়ল, ভেবেছিলেন। যুগলকে পূর্ণ গাঙুলীর পশ্চাদনুগমন করতে যে দিন দেখেছিলেন সেইদিনই তাঁর মনেও এ আশঙ্কা হয়েছিল নই কি। তিনি প্রতি মুহূর্তেই কিছু একটা প্রত্যাশা করছিলেন...কিন্তু ঠিক এ রকম নয়...এটা তিনি প্রত্যাশা করেন নি ঠিক...না, খুন করবে এটা ভাবেন নি।

"এ কি কখনও সত্যি হতে পারে? আমাকে কত ভালবাসে, কত শ্রদ্ধা করে—কালই তো বলছিল বুক চাপড়ে চাপড়ে—গতনিটা কাঁপছিল। সব মিছে কথা? মোটেই না। ও রকম লোক আছে। ওরা একাধারে নীচ এবং মহৎ—স্ত্রীর প্রণয়ীকে স্বচ্ছন্দে শ্রদ্ধা করতে পারে ওরা। স্ত্রীর সঙ্গে কুড়ি বছর বাস করল, তার এতটুকু স্খলন চোখে পড়ল না অথচ' আমার

কথা, আমার ব্যবহার, আমার কবিতার লাইন—ন'বছর ধরে' শ্রদ্ধাসহকারে মনে করে' রেখেছে ও। অথচ আমি এর কিছুই জানতাম না। কিন্তু কাল তো বলেছিল "আমি বোঝাপড়া করতে চাই"—এটা কি ভালবাসার লক্ষণ? হতে পারে বই কি। আমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে বলেই অত্যন্ত ভালবাসে হয় তো…"

বর্দ্ধমানে থাকতে হয় তো—হয় তো কেন নিশ্চয়ই—খুব বেশী রকম অভিভূত হয়ে পড়েছিল লোকটা আমাকে দেখে…ওরা সহজেই অভিভূত হয়। আমাকে একটু ভাল লাগতেই শতগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল আমাকে মনে মনে। কি দেখে ভাল লেগেছিল জানতে ইচ্ছে হয়…হয় তো আমার কামিজের ছিট বা সিগারেট-হোলডার দেখে! ওই সবে খুব মুগ্ধ হয় ওরা। কামিজের ছিটটুকু ওরা দেখতে পায়, বাকীটা সৃষ্টি করে' নেয় কল্পনায়। তারপর ভক্ত হয়ে পড়ে। আর…। আমার লোককে মুগ্ধ করবার ক্ষমতাও হয় তো তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।…এসে বললে, আপনাকে জড়িয়ে ধরে' আমি কাঁদতে এসেছি…অথচ এসেছিল খুন করতে…। পাপিয়াকেও এনেছিল সঙ্গে করে'।"

হঠাৎ পুরন্দরবাবুর মনে হল—"কি জানি, হয় তো আমিও যদি কাঁদতাম ওর গলা জড়িয়ে, তাহলে হয় তো ও আমায় ক্ষমা করত। ক্ষমা করতেই তো এসেছিল। ক্ষমা করবার ভয়ানক একটা আগ্রহ ছিল তাঁর।…প্রথম ধাক্কাতেই কিন্তু বদলে গেল লোকটা, সুরই বদলে ফেললে। মেয়েলি সুরে সুরু হয়ে গেল ভ্যানভ্যানানি আর প্যানপ্যানানি। সব বলবার জন্যে ইচ্ছে করে' মাতাল হয়ে আসত, কিন্তু সবটা মাতলামিই হয়ে পড়ত আর কিছু হত না। মদ না খেলেও ও কিছু বলতেও পারত না। ভাঁড়ামি করা স্বভাব লোকটার…আমাকে দিয়ে চুমু খাইয়ে কি ফুর্ত্তি…তখনও ঠিক করতে পারে নি বোধ হয় যে খুন করবে, না ভাব করবে। দুইই করবার ইচ্ছে ছিল বোধ হয়। উদারহৃদয় পিশাচই সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। প্রকৃতি তাদের মা নয়,

সৎ মা—তাদের পীড়ন করে কেবল, স্নেহ করে না। পাগল করে' তোলে শেষ পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করবে—আমাকে নিয়ে গেছে বউ দেখাতে! কি বোকা! বউ! যুগল পালিতের বউ! ওর মতো গাড়োলই ভাবতে পারে যে ও আবার বিয়ে করে' সুখী হবে। কচি মেয়েটার দফা নিকেশ করবার চেষ্টায় আছে···তোমার দোষ নেই যুগল···তোমার আশা আকাঙ্ক্ষাও তোমারই মতো অদ্ভুত। অদ্ভুত যে তা নিজেও বোধ হয় বুঝত, তাই শ্রদ্ধেয় পুরন্দরকে দিয়ে নিজের খেয়ালটাকে যাচিয়ে নেবার প্রয়োজন হয়েছিল! আমাকে দিয়ে বিয়েটা সমর্থন করিয়ে নেবার তাই বোধ হয় এত আগ্রহ।...ভুলে ক্ষুরটা যদি বাইরে ফেলে না রাখতাম তাহলে বোধ হয় কিছু হত না। তাই কি? আমার জন্যেই যদিও এসেছিল, তবু এড়িয়েই চলছিল আমাকে, পনর দিন তো দেখাই করে নি। পূর্ণ গাঙ্গুলীকে নিয়ে পড়েছিল প্রথমে।···কাল আমাকে কম্প্রেস দেবার কি ধুম! কাকে ভোলাচ্ছিল? আমাকে, না, নিজেকে?"

একই কথা নানাভাবে ক্রমাগত ভাবতে লাগলেন পুরন্দরবাবু, শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে উঠে অনুভব করলেন মাথাটা বেশ ধরে' আছে—শুধু তাই নয়, নতুন ধরণের একটা আতঙ্কও বসে আছে সারা মন জুড়ে।

নতুন ধরণের আতঙ্কটা বেশ অপ্রত্যাশিত। তাঁর মনে হতে লাগল যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে যুগল পালিতের কাছে যেতে হবে। কেন? কি দরকার? তা তিনি জানেন না, জানতে চানও না—এইটে শুধু অনুভব করছিলেন যে যেতে হবে। কারণ যা-ই হোক। এই পাগলামির—পাগলামি ছাড়া আর কি—একটা অজুহাতও জুটে গেল শেষ পর্য্যন্ত। তাঁর ভয় হচ্ছিল যুগল পালিত হয়তো গলায় দড়ি দেবে। কেন? তখনই মনে হল অনুরূপ অবস্থায় পড়লে আমিও হয়ত দিতাম।

শেষ পর্য্যন্ত যুগলের বাসার দিকেই অগ্রসর হলেন তিনি। ভাবলেন চাকরটার কাছে খোঁজ নিয়ে চলে আসব। কিছুদূর গিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মনে হল তার কাছে নতজানু হয়ে গলদশ্রুলোচনে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি না কি? এইটে করলেই তো চূড়ান্ত হয়ে যায়!

কিন্তু ভগবান রক্ষা করলেন তাঁকে—হঠাৎ দিলীপ হালদারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাঁর। দিলীপ উর্দ্ধশ্বাসে আসছিল—ভয়ানক উত্তেজিত মনে হল।

"আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। যুগলবাবু কি করলে জানেন শেষ পর্য্যন্ত?"

"গলায় দড়ি দিয়েছে না কি।"

"কে গলায় দড়ি দিয়েছে? কেন?"

"না না কিছু নয়—কি বলছিলেন বলুন।"

"কি যে অদ্ভুত কথা সব বলেন আপনি! গলায় দড়ি দিতে যাবে কোন দুঃখে। চলে গেল। আমি তাঁকে ট্রেণে তুলে দিয়ে আসছি। উঃ! কি ভয়ানক মদ খায়। একটি বোতল পুরো খেয়ে ফেললে। ট্রেণে গান গাইছিল, আপনাকে নমস্কারও জানিয়েছে। আচ্ছা, লোকটা একটা স্কাউণ্ড্রেল, নয়?"

পুরন্দরবাবু অট্টহাস্য করে' উঠলেন।

"সব ছেড়েছুড়ে চলে গেল শেষ পর্য্যন্ত। অ্যাঁ! চলে গেল!"

"হ্যাঁ। জ্যাঠামশায়ের কাছে গিয়ে খুব লাগান-ভাঙান করলে, কিন্তু কিছু হল না। পারুল কিছুতে রাজি হল না। আপনার কথা খুব বলছিল কিন্তু। মানে বিরুদ্ধে—। যাই বলুক, আমাদের কিন্তু আপনার উপর শ্রদ্ধা এতটুকু কম না। আপনি যে ভদ্রলোক তা একনজরেই বোঝা যায়। আজকাল মুশকিল কি হয়েছে জানেন, শ্রদ্ধা করবার মতো লোক খুঁজে পাওয়া শক্ত। বুড়ো হলেই শ্রদ্ধেয় হয় না, কি বলেন? ও আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছে···এই নিন—ভুলেই যাচ্ছিলাম।"

পুরন্দরবাবু চিঠিটা নিয়ে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে'।

"আপনার হাতে কি হল ?"

"কেটে গেছে।"

"কি করে ?"

"এমনি, ছুরিতে—তোমাদের বিয়ে হচ্ছে কবে ?"

"আমাদের ? সে এখন সুদূরপরাহত। তবে এই ফাঁড়াটা খুব কেটে গেল। আচ্ছা চললাম তাহলে আমি। আমার অনেক কাজ···চলি।"

মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে দিলীপ হালদার গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পুরন্দরবাবু বাড়ি ফিরে এসে চিঠিটা খুললেন। খামের ভিতর যুগলের লেখা একটি ছত্রও ছিল না। চিঠির কাগজ এত পুরোনো যে হলদে হয়ে গেছে, কালির রংও বিবর্ণ। চিঠিখানা অপর্ণা তাকে লিখেছিল···বহুদিন আগে! এ চিঠি তো তিনি পান নি! এর বদলে আর একটা চিঠি পেয়েছিলেন। এ চিঠিতে অপর্ণা তাঁর কাছে বিদায় চাইছে। লিখেছে যে আর একজনকে সে ভালবেসেছে। সে যে সন্তানসম্ভবা সে কথাও লিখেছে। "যদি বলেন আপনার সন্তানকে আপনার কাছে পৌঁছেও দিতে পারি···হাজার হোক আপনারও একটা কর্ত্তব্য আছে তো"···এ কথাও লিখেছে।

পুরন্দরবাবুর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল সহসা। চিঠিখানা পড়তে পড়তে তিনি কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন—যুগল যখন চিঠিখানা প্রথম পড়েছিল তখন কি রকম মুখভাব হয়েছিল তার।

১৭

ঠিক দুটি বছর অতীত হয়েছে।

পুরন্দর রায়চৌধুরী লক্ষ্ণৌ চলেছেন। সেখানে এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে, শুধু নিমন্ত্রণ নয়, চমৎকার সম্ভাবনাও আছে একটা। একটি সুরসিকা সুন্দরীর সঙ্গে অনেক দিন থেকে আলাপ করার ইচ্ছে—এই বন্ধুটির সাহায্যে সে বাসনা চরিতার্থ হবার সম্ভাবনা আছে। এই দু'বছরে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাঁর। যে সব মানসিক পীড়ায় তিনি সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকতেন তা আর নেই। দু'বছর আগে কোলকাতায় মকোর্দ্দমার হাঙ্গামার মধ্যে যে সব অদ্ভুত 'স্মৃতি' পাগল করে' তুলত তাঁকে—সে সব তরোহিত হয়েছিল। নিজের সে সব দৌর্ব্বল্যের কথা স্মরণ করে' এখন মাঝে মাঝে লজ্জিত হন শুধু। এখন প্রতিজ্ঞা করেছেন ও জাতীয় দুর্ব্বলতাকে আর প্রশ্রয় দেবেন না কখনও। তখন কারও সঙ্গে মিশতেন না, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতেন, নোংরাভাবে থাকতেন···সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে যেত তাঁর ব্যবহারে—এখন আর সে সব কিছু নেই। এখন সকলের সঙ্গে মেশেন হাসেন, কথা কন, যেন কিছুই হয় নি। এই পরিবর্ত্তনের মূল কারণ অবশ্য মকোর্দ্দমাটা জিতেছিলেন তিনি। তিন লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন সব শুদ্ধ। তিন লক্ষ টাকা অবশ্য খুব বেশী টাকা নয়, কিন্তু তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। প্রথমতঃ—দাঁড়াতে পেরেছেন যে এতেই খুশী আছেন তিনি। প্রথম যৌবনে বোকার মতো অনেক টাকা উড়িয়েছেন এবার শিক্ষা হয়ে গেছে। যদি না ওড়ান তাহলে যা আছে তা তাঁর জীবনের পক্ষে যথেষ্ট।

হুজুকে মাতবার আর প্রবৃত্তি নেই···নিজের ক্ষুদ্র স্বর্গেই সন্তুষ্ট আছেন তিনি। নিজের পছন্দ মতো খাবারটি, দু' একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু, এক আধটি বান্ধবী, খান কয়েক ভাল বই—এর বেশী কিছু কাম্য নেই তাঁর আর। এই জীবনেই ক্রমশঃ মশগুল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। আগেকার উদ্দাম পুরন্দরবাবু আর ছিলেন না। চেহারারও পরিবর্ত্তন হয়েছিল। বেশ শান্ত গম্ভীর প্রফুল্ল মুখ-শ্রী হয়েছিল এখন। বলি-রেখাগুলো পর্য্যন্ত ছিল না। রংও ফিরে গিয়েছিল।

প্রথম শ্রেণীর একটা কামরায় বসেছিলেন তিনি। পরের ষ্টেশন মোগলসরাই। আর একটা মনোরম কল্পনায় তা দিচ্ছিলেন তিনি বসে' বসে'। ভাবছিলেন "কাশীটা ঘুরে গেলে কেমন হয়। কাশী থেকে তারপর লক্ষ্ণৌ যাওয়া যাবে। কাশীতে মীনা বসে' বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করছে, তার সঙ্গে একটু আড্ডা দিয়ে গেলে মন্দ হয় না।" মীনা তাঁর একজন প্রাক্তন বান্ধবী। মোগলসরাইয়ে নেবে পড়বেন কি না ঠিক করতে পারছিলেন না। কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটল যে দ্বিধার আর অবসর রইল না।

মোগলসরাই ষ্টেশনে অনেকক্ষণ গাড়ি থামে। কিছু খেয়ে নেবার জন্যে পুরন্দরবাবু গাড়ি থেকে নাবলেন। কেলনারের কাছে গিয়ে দেখেন একটা ভীড় জমে গেছে। একটি সুসজ্জিতা যুবতীকে কেন্দ্র করে দুটি লোক খুব উত্তেজিত হয়েছেন···একটি মাড়োয়ারি এবং একটি বাঙালী ছোকরা। যুবতীটির অলঙ্কার এবং পোষাক পরিচ্ছদের জাঁকজমক দেখলে হাসি পায়··· কিন্তু তিনি সুন্দরী এবং যুবতী—সুতরাং না হেসে সবাই হাঁ করে' চেয়েছিল তাঁর দিকে। মাড়োয়ারিটি নাকি পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় মেয়েটির গায়ে হাত দিয়েছে···বাঙালী ছোকরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন তা। প্রতিবাদ করাতে মাড়োয়ারি অপমানসূচক কথা বলেছে কি একটা। বাঙালীটি যদিও বলিষ্ঠ যুবক, কিন্তু এত মদ্যপান করেছেন যে দাঁড়াতে পারছেন না ভাল করে'। মাড়োয়ারি তাঁর এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে তম্বি করছে। মেয়েটি সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে আছে একধারে এবং মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে—"আপনি

সরে' আসুন বীরেনবাবু" বলছে ; এমন সময় রঙ্গস্থলে পুরন্দর প্রবেশ করলেন এবং নিমেষের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে' যা করলেন তা বাস্তবিকই নাটকীয়। এক বিরাট চপেটাঘাতে মাড়োয়ারিটিকে নিরস্ত করে' ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে বললেন—"বসুন আপনারা কেলনারে গিয়ে। এর ব্যবস্থা আমি করছি। এখানকার দারোগার সঙ্গে আলাপ আছে আমার।"

পুরন্দরবাবুর চেহারা এবং পরুষ ব্যবহার দেখে মাড়োয়ারি হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে ব্যবসায়ী লোক, ভীড়ের মধ্যে স্ত্রী-অঙ্গের লালিত্যটুকু বিনা পয়সায় উপভোগ করতে গিয়ে বিপন্ন হয়েছে যদিও—কিন্তু ব্যবসায়-বুদ্ধিই তাকে বাঁচালে শেষ পর্য্যন্ত। পুরন্দরবাবু-জাতীয় লোকদের সে চেনে, এদের কি করে' বশ করতে হয় তাও জানা আছে। ঝুঁকে সেলাম করে' বললে "মাফি মাংতে হেঁ হুজুর। ভীড় মে হাত লাগ গিয়া থা।"

পুরন্দরবাবু তাঁকে ছেড়ে দিলেন। মহিলাটির দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "চলুন আমরা চা খাই গে।"

বীরেনবাবু টলছিলেন। তিনি নমস্কার করে' বললেন—"ধন্যবাদ মশাই। বেশ করেছেন, খুব করেছেন। ব্যাটা মেড়ো···"

"চলুন চা খাওয়া যাক" পুরন্দরবাবু আবার বললেন।

"উনি যে ট্রেন থেকে নেবে কোথা গেলেন" মহিলাটি এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন বিরক্তিভরে।

"উনি আসবেন এখুনি। জিনিস সামলাচ্ছেন"—বীরেনবাবু বললেন।

"আপনারা কেলনারে বসুন ততক্ষণ। আমি খুঁজে আনছি তাঁকে। কি নাম ভদ্রলোকের—?"

"যুগল পালিত।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেঁটে যুগল পালিত ভীড় ঠেলে এসে হাজির হল। পুরন্দরবাবুকে দেখে চমকে উঠল সে—যেন ভূত দেখেছে। হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইল। তার স্ত্রী তাকে যা বলছিল তা যেন সে শুনতেই পাচ্ছিল না,

পুরন্দরবাবুকে দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সে। তার স্ত্রী বলছিল—"ওই ভদ্রলোক না থাকলে যে কি মুশকিলেই পড়তাম আমি—"

পুরন্দরবাবু হেসে উঠলেন।

"আরে! যুগলবাবু নাকি"—তারপর তার স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন—"আমরা দুজন পুরোনো বন্ধু…। আপনাকে পুরন্দরের কথা বলেনি কখনও?"

"না, বলেনি তো—"

"বলা উচিত ছিল। দিন, ফর্মালি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিন। বিয়ের সময় একটা খবরও তো দিলেন না। আচ্ছা লোক আপনি মশাই—"

যুগল আমতা আমতা করে' বললে—"ও হ্যাঁ—বিয়ের সময় নানা গোলমালে—হ্যাঁ…ললু…ইনি ইনি আমার বন্ধু…পুরোনো বন্ধু পুরন্দরবাবু—"

বলতে বলতে থেমে গেল সে হঠাৎ—দুটো চোখ দিয়ে দু'ঝলক আগুন বেরুল যেন।

পুরন্দরবাবু হাত তুলে নমস্কার করলেন। 'ললু'ও প্রতি-নমস্কার করে' বললেন, "ভাগ্যে আপনি ছিলেন, তা না হলে কি মুশকিলেই যে পড়তাম।"

পুরন্দরবাবু সকলকে নিয়ে কেলনারে ঢুকলেন। একটু পরেই পরিচয় হয়ে গেল ভাল করে'। পুরন্দরবাবুর পরিচয় শুনে ললু একমুখ হেসে বললেন—"আপনিও বেড়াতে বেরিয়েছেন? চলুন না আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার। আমরা একটা বাড়ি নিয়েছি সেখানে একমাসের জন্যে। চলুন না, যাবেন?"

"বেশ তো। দিন দশেক পরে যেতে পারি।"

যুগল পালিতের মুখখানা কালো হয়ে গেল।

বীরেনবাবু হাত ঘড়ি দেখে বললেন—"আর বেশী দেরী নেই কিন্তু। এবার ওঠা যাক—"

পুরন্দরবাবু হরিদ্বারে যাবেন শুনে বীরেনও একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল। চা খাওয়া কোন রকমে সেরে সে ললুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে ট্রেণে উঠল। যুগল পালিত বসে রইল। ওরা চলে যেতেই সে

পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে স্খলিতকণ্ঠে জিগ্যেস করলে—"সত্যিই আসছেন আপনি হরিদ্বারে ?

"আপনি একটুও বদলান নি দেখছি"—হেসে ফেললেন পুরন্দরবাবু—

"আপনি সত্যিই ভেবেছেন আমি যাব ? পাগল না কি, আমার সময় কোথায় হা—হা—হা—"

যুগল পালিতের মুখও উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"ও যাচ্ছেন না তাহলে—"

"না যাচ্ছি না, ভয় নেই আপনার।"

"যা খুশী বলবেন। বলবেন আমার পা ভেঙে গেছে—।"

"বিশ্বাস করবেন না সে কথা।"

"না করলেই বা। ও বাবা, গিন্নির ভয়ে যে একেবারে অস্থির দেখছি।" যুগল হাসবার চেষ্টা করলে একটু কিন্তু পারলে না। পুরন্দরবাবুর ব্যঙ্গটা কশাঘাত করলে যেন তাকে।···গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। পুরন্দরবাবু ঠিক করে' ফেলেছিলেন এ গাড়িতে আর যাবেন না, এখানেই ব্রেক জার্নি করবেন। ষ্টেশন প্লাটফর্মে থাকতে তাঁর ভারী ভাল লাগে। জিনিসপত্র ওয়েটিংরুমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পুরন্দরবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—"এই বীরেনবাবুটি কে ?"

"ও আমার দূর সম্পর্কের একজন ভাই হয়। ভাল ফুটবল খেলত। একটা চাকরিও করে' দিয়েছিলাম, কিন্তু রাখতে পারলে না। মদেই মাটি করেছে ওকে···।"

পুরন্দরবাবুর মনে হল—"বাঃ, ঠিক জুটে গেছে, ষোলকলা পূর্ণ একেবারে।"

"যুগলদা, আসুন না।"

বীরেন গাড়ি থেকে ডাকতে লাগল।

যুগল পালিত উঠতে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ পুরন্দরবাবু তাকে

বললেন—"এখন যদি আপনার স্ত্রীকে গিয়ে বলি যে আপনি রাত্রে আমাকে খুন করতে গিয়েছিলেন, কেমন হয় তা হলে ?"

"অ্যাঁ, কি যে বলেন !" যুগলের মুখ পাংশু বর্ণ হয়ে গেল।

"যুগলদা, যুগলদা ও যুগল দা— ।"

বীরেনবাবুর জড়িত কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল।

"আচ্ছা যান আপনি।"

"সত্যিই আপনি আসছেন না তো ?"

"শপথ করব ? ট্রেণ ছাড়ছে যান।" এই বলে' পুরন্দরবাবু সহাস্যে সাহেবী ভঙ্গীতে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন শেকহ্যাণ্ড করবার জন্যে। বাড়িয়েই কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হল, যুগল হাত বাড়ালে না। এমন কি সরিয়ে নিলে।

গাড়ি ছাড়বার তৃতীয় ঘণ্টা পড়ল।

মুহূর্ত্তে দু'জনের মধ্যে কি একটা কাণ্ড ঘটে গেল যেন। কি একটা যেন ছিঁড়ে গেল, কেটে গেল। পুরন্দরবাবু হঠাৎ বজ্রমুষ্টিতে যুগলের ঘাড়টা ধরে কাটা হাতটা তার মুখের সামনে ধরে বললেন—"এই হাত আমি বাড়িয়ে দিতে পারলাম, আর আপনি সেটা নিতে পারলেন না।"

যুগলের ঠোঁট কাঁপতে লাগল, সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে—"আর পাপিয়া ?"

হঠাৎ তার ঠোঁট, গাল, থুতনি সব থর থর করে কেঁপে উঠল, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। পুরন্দরবাবু তাকে ছেড়ে দিয়ে নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"যুগল দা, কি করছ তুমি, ট্রেণ যে ছাড়ে—"

গার্ডের হুইসল্ শোনা গেল।

যুগল পালিত হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল এবং চলন্ত ট্রেণে লাফিয়ে উঠে পড়ল। পুরন্দরবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে'।